দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

ভারতের শিক্ষানীতি ২০২০
হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের পথে — পৃঃ ৮

এই দেশে দাঙ্গার অধিকার কাদের ?
— পৃঃ ৩২

৭৩ বর্ষ, ২ সংখ্যা।। ২৪ আগস্ট, ২০২০।। ৭ ভাদ্র - ১৪২৭। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

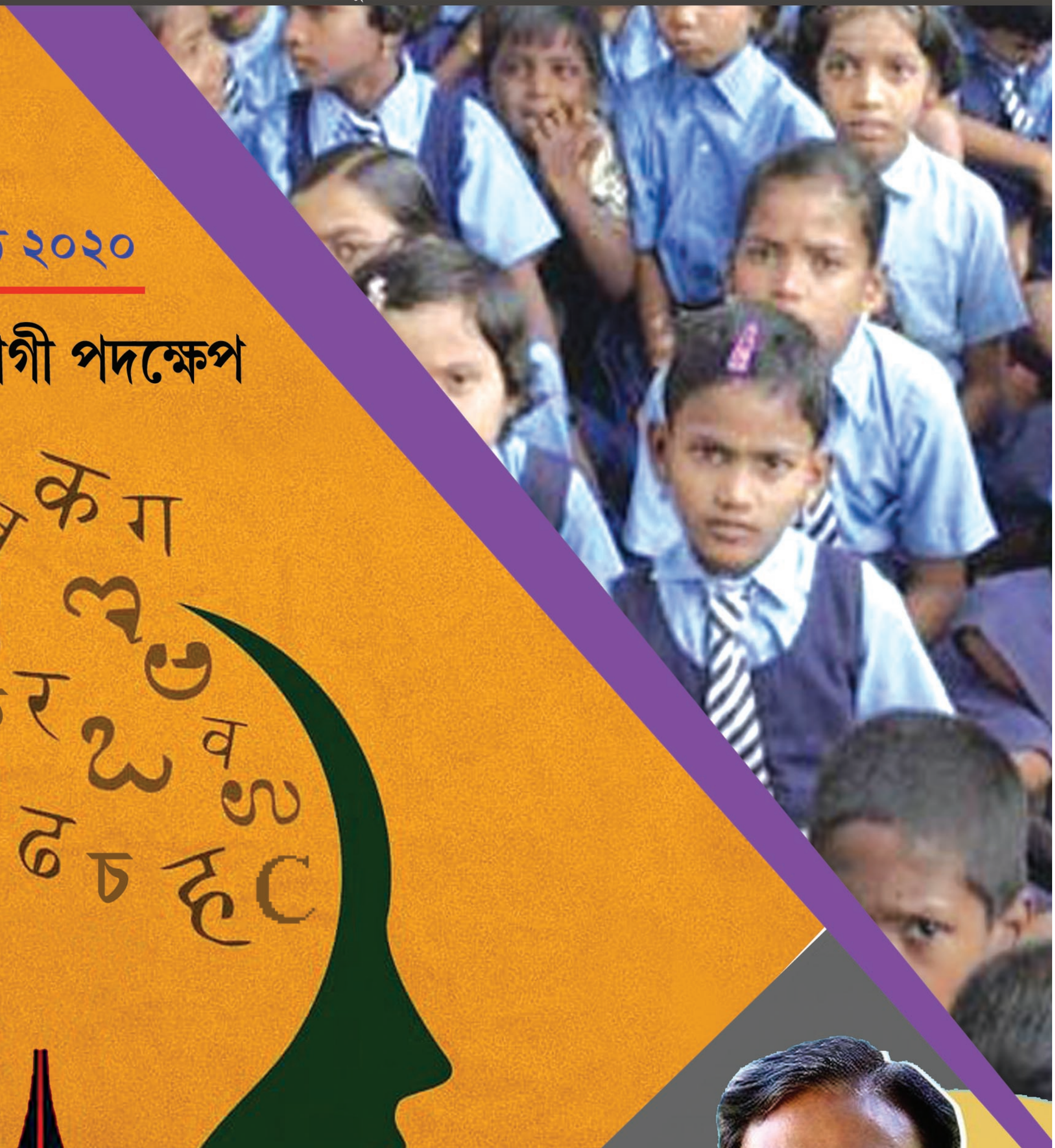

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০

এক যুগোপযোগী পদক্ষেপ

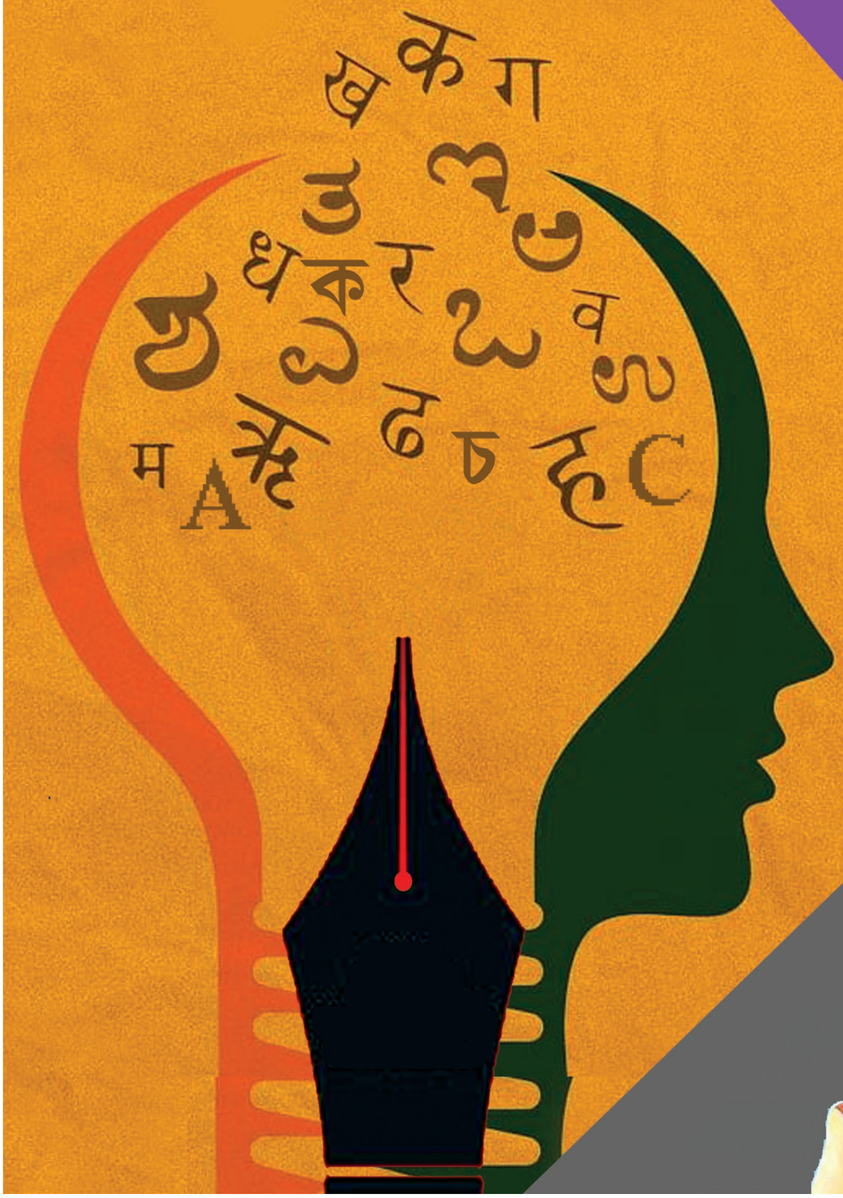

पतंजलि®
प्रकृति का आशीर्वाद
करोड़ों देशवासियों का
भरोसेमन्द हर्बल टूथपेस्ट
दन्त कान्ति
PATANJALI
DANT KANTI
TIGHTENS GUMS
FIGHTS GERMS
पतंजलि
दन्त कान्ति
मज़बूत मसूड़े
कीटाणुओं से लड़े
दाँतों को दे असरदार सुरक्षा
PATANJALI
Medicated
PATANJALI
Junior
दन्त कान्ति के लाभ
✓ लौंग, बबूल, नीम, अकरकरा, तोमर, बकुल आदि बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित दन्त कान्ति, ताकि आपके दाँतों को मिले लंबी उम्र व असरदार प्राकृतिक सुरक्षा।
✓ पायरिया, मसूड़ों की सूजन, दर्द व खून आना, सेंसिटिविटी, दुर्गन्ध एवं दाँतों के पीलेपन आदि को दूर करे।
✓ कीटाणुओं से लम्बे समय तक बचाकर दे दाँतों को प्राकृतिक सुरक्षा कवच।
पूरी दुनिया अब नैचुरल प्रोडक्ट्स को अपना रही है
आप भी पतंजलि के नैचुरल प्रोडक्ट्स अपनाइए और प्रकृति का आशीर्वाद पाइए
आवाहन– राष्ट्र के जागरुक व्यापारियों व ग्राहकों से हम विनम्र आवाहन करते हैं कि करोड़ों देश भक्त भारतीयों की तरह, आप भी पतंजलि के उत्पादों को अपनी दुकानों व दिलों में सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जन–जन तक पहुँचाएं और देश की सेवा व समृद्धि में योगदान दें। जिससे महात्मा गाँधी, भगत सिंह व राम प्रसाद बिस्मिल आदि सभी महापुरुषों के स्वदेशी अपनाने के सपने को मिलकर साकार कर सकें।
पढ़ेगा हर बच्चा
बनेगा स्वस्थ और सच्चा
दन्त कान्ति का पूरा प्रॉफिट एजुकेशनल चैरिटी के लिए समर्पित है
पतंजलि आयुर्वेद के लगभग 500 उत्पाद हैं, ये शुद्ध खाद्य उत्पाद व हर्बल सौन्दर्य उत्पाद हमारे पतंजलि स्टोर्स के साथ ओपन मार्केट की दुकानों पर भी उपलब्ध है।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ২ সংখ্যা, ৭ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

২৪ আগস্ট - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

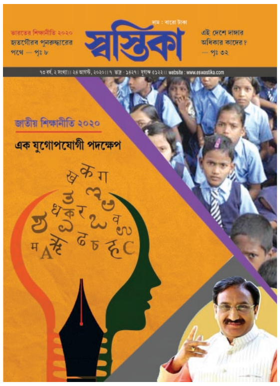

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৪

কেন্দ্রের জাতীয় শিক্ষানীতি : ভারতের জগদ্‌গুরু হওয়ার স্বপ্ন পূরণের পথে □ অভিমন্যু গুহ □ ৫

ভারতের শিক্ষানীতি ২০২০ : হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের পথে □ ড. সুজিৎ রায় □ ৮

ভারতের শিক্ষানীতি ২০২০ : এক যুগোপযোগী পদক্ষেপ □ রামানুজ গোস্বামী □ ১১

ভারতের শিক্ষানীতি ২০২০ : উন্নত ভারতের দিক্‌নির্দেশ □ রবি রঞ্জন সেন □ ১৫

কেবল ধ্রুপদী শিক্ষাক্রমই শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটায় □ প্রবীর ভট্টাচার্য্য □ ১৮

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি : এক আশার আলো □ ড. নারায়ণ চক্রবর্তী □ ২০

জাতীয় শিক্ষানীতি : বামপন্থীদের কুম্ভীরাশ্রু □ অনুপম বেরা □ ২২

বাস্তবে প্রয়োগ হোক রাষ্ট্রীয় ভাবনার নতুন শিক্ষানীতি □ ধর্মানন্দ দেব □ ২৪

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ ভারতীয় জীবন দৃষ্টি □ ইন্দুমতী কাটদরে □ ২৬

অখণ্ড ভারতের স্মরণ মনন আজ বড়ো প্রয়োজন □ প্রবাল □ ২৯

এই দেশে দাঙ্গার অধিকার কাদের ? □ দেবযানী হালদার □ ৩২

বাংলাদেশে হিন্দুদের বাঁচার উপায় কী ? □ শিতাংশু গুহ □ ৩৫

নেহরুভিয়ান সোশ্যালিজম এবং নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর ভারত □ ডা: আর এন দাস □ ৩৬

চীনা আমদানি আমাদের পরম্পরাগত বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করে দিচ্ছে □ ঋতু কুমার □ ৩৯

ভারতীয় কৃষকের আরাধ্য দেবতা ভগবান বলরাম □ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ৪৩

করোনা আবহে মা-ই পড়ুয়াদের একমাত্র সহায় □ সুতপা বসাক ভড় □ ৪৪

বৈষ্ণব জগতে ইন্দ্রপতন : শ্রীজীবশরণ দাস প্রভু নিত্যনন্দ চরণে সমাহিত হলেন □ তিলক সেনগুপ্ত □ ৪৫

চিঠিপত্র : ৪১

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নব দিগন্তের উন্মেষ করিবে নূতন এই শিক্ষানীতি

একদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ মেকলে সাহেব চাহিয়াছিলেন ভারতীয়দের মধ্যে এমন একটি শ্রেণীর সৃষ্টি করিতে, যাহারা শারীরিক ভাবে ভারতীয় হইলেও মানসিক ভাবে ভারতীয় কোনোমতেই হইবে না। ভারতীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধাহীন একটি ভারতীয় গোষ্ঠীরই জন্ম দিতে চাহিয়াছিলেন মেকলে সাহেব। এই আকাঙ্ক্ষাটি যে ভারতবিদ্বেষী সাম্রাজ্যবাদী মেকলের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ছিল — তাহা একেবারেই নয়। সামগ্রিক ভাবে ব্রিটিশ শাসকের ইচ্ছারই বাস্তব রূপ দিয়াছিলেন মেকলে সাহেব। মেকলে ও ব্রিটিশ শাসকরা বুঝিয়াছিলেন, ভারতের অভ্যন্তরেই যদি ভারতবিদ্বেষীর জন্ম দিতে হয় — তাহা হইলে মোক্ষম যে অস্ত্রটি ব্যবহার করিতে হইবে তাহার নাম শিক্ষা। ভারতবর্ষে এমন একটি শিক্ষানীতি রচনা করিতে হইবে, যে শিক্ষানীতি ভারতীয় পরম্পরার প্রতি কোনো শ্রদ্ধার উদ্রেক করিবে না, যে শিক্ষানীতি ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটাইবে না। পরিবর্তে একদল কেরানির জন্ম দিবে। এই কাজে মেকলে ও ব্রিটিশ শাসকরা যে সফল হইয়াছিলেন—তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। স্বাধীনতার পরও এই দেশের নেহরুপন্থী এবং তাহাদের সঙ্গী বামপন্থী শাসকরা মেকলে নির্দেশিত শিক্ষানীতি পরিবর্তনের কোনো সদিচ্ছাই দেখান নাই। বরং সেই শিক্ষানীতিতেই প্রজন্মের পর প্রজন্মকে চালিত করিয়াছে। ফলে, ভারতীয় পরম্পরা, ভারতীয় ঐতিহ্য এবং ভারতের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে বেশ কয়েকটি প্রজন্ম অজ্ঞই থাকিয়া গিয়াছে। প্রতিভা স্ফুরণের পরিবর্তে কেরানিই বেশি সৃষ্টি হইয়াছে এই দশে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার প্রথমবার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসিবার পর উপলব্ধি করে— শিক্ষা সংস্কারের কাজটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে শুধু কেরানি সৃষ্টি নহে, ব্যক্তিত্বের বিকাশ— নরেন্দ্র মোদীর সরকার তাহা উপলব্ধি করে। ফলে, দেশের শিক্ষানীতিটি কীরূপ হইবে, কেমন হওয়া উচিত— তখন হইতেই বিষয়টি লইয়া সরকারি স্তরে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। গত ছয় বৎসর ধরিয়া বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষাবিদদের সঙ্গে বিভিন্ন স্তরে আলোচনা ও মত বিনিময়ের পর কেন্দ্র সরকার এইবার এই নূতন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করিয়াছে। এই কথাও উল্লেখ করা আবশ্যকীয় যে, এই নূতন জাতীয় শিক্ষানীতি রচনার পিছনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘেরও যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। সঙ্ঘ দীর্ঘকাল যাবৎ শিক্ষানীতিতে সংস্কারের কথা ভাবিয়া আসিয়াছে।

এই নূতন জাতীয় শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্য এই যে, মেকলের সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারা হইতে এই শিক্ষানীতি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুক্তির পথ দেখাইয়াছে। এই শিক্ষানীতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং প্রতিভা স্ফুরণের অবকাশ রাখা হইয়াছে। সর্বোপরি, এই শিক্ষানীতি ভারতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাসের প্রতি পড়ুয়াদের শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলিতে উদ্যোগী হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, দেশের প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানই দেশের নাগকিককে দেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলিতে পারে। এই শিক্ষানীতিতে রবীন্দ্রনাথের সেই চিন্তাই গুরুত্ব পাইয়াছে, সাম্রাজ্যবাদী মেকলে পরিত্যক্ত হইয়াছে। শিক্ষার জগতে এই নূতন জাতীয় শিক্ষানীতি এক নব দিগন্তের উন্মেষ করিবে — এই আশা আমরা করিতেই পারি।

সুভাষিতম্

নিস্যারস্য পদার্থস্য প্রায়েণাডম্বরো মহান্।
ন হি স্বর্ণে ধ্বনিস্তাদৃগ্ যাদৃক্ কাংস্যে প্রজায়তে।।
সারহীন বস্তুর শব্দ বেশি হয়ে থাকে। সোনার এত শব্দ হয় না যে রকম পেতলের হয়ে থাকে।

কেন্দ্রের জাতীয় শিক্ষানীতি

ভারতের জগদ্‌গুরু হওয়ার স্বপ্ন পূরণের পথে

অভিমন্যু গুহ

কেন্দ্রীয় সরকার নতুন শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছে। সত্যি কথা বলতে কী, জাতীয় শিক্ষানীতি বলতে যা বোঝায় তা আমাদের কোনোকালেই ছিল না। যা ছিল তা হলো ১৯৮৪ সালে রাজীব গান্ধী সরকারের আমলে পাশ হওয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি, যা ১৯৯২ সালে সামান্য কিছু সংশোধন হয়। একেই এতদিন জাতীয় শিক্ষানীতির তকমা দিয়ে চালানো হচ্ছিল, কিন্তু রাজ্যে রাজ্যে তার যে বৈষম্য তাও প্রকটিত হয়েছিল। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষায় যে অসাম্য, যাও-বা চেপে রাখা সম্ভব হচ্ছিল, কিন্তু স্কুল শিক্ষা ও তার হাত ধরে উচ্চশিক্ষায় এই বৈষম্য বেআব্রু হয়ে পড়েছিল। যাদের অভিভাবককের কর্মসূত্রে বদলির কারণে স্কুলজীবন একাধিক রাজ্যে অতিবাহিত হয়েছে বা যারা উচ্চশিক্ষার কারণে ভিন রাজ্যের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছেন, তারা খুব ভালোভাবেই জানেন অপরিচিত শিক্ষা-ব্যবস্থা পদ্ধতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে তাঁদের কতটা নাজেহাল হতে হয়েছিল। বহু ছাত্রের উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি শুধুমাত্র রাজ্যে রাজ্যে শিক্ষানীতির এই বৈষম্যের কারণে। অথচ রাজীব গান্ধী সরকারের শিক্ষাক্ষেত্রে নয়া জাতীয় নীতি প্রণয়নের প্রাথমিক লক্ষ্যই ছিল রাজ্যে রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থার অসাম্য দূর করা ও সব রাজ্যে শিক্ষার সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত করা।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা কার্যকর করা অসম্ভব হয়েছিল। কারণ সরকারের সার্বিক নীতিতেই অসাম্য হয়ে গিয়েছিল। 'এক দেশ দো বিধান দো নিশান'-এর যে প্রথা স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে কার্যকর হয়েছিল, দেশের শিক্ষানীতিও তার ব্যতিক্রম হতে যাবে কোন দুঃখে! সুতরাং গলদটা ছিল দেশের

> এই সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতিকে সরকারের সামগ্রিক নীতির সঙ্গে আলাদা করে দেখা যাবে না। ভারতকে জগৎশ্রেষ্ঠ করার যে সামগ্রিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, জাতীয় শিক্ষানীতি তার একটি পদক্ষেপ মাত্র।

সরকারকে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় সুদীর্ঘকাল যারা পরিচালনা করেছিলেন তাদের নীতির মধ্যেই। স্বাধীনতার পর দেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলনা আবুল কালাম আজাদ দেশে অভিন্ন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৪৮-৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন, ১৯৫২-৫৩ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন চালু করেছিলেন। কিন্তু এই কমিশনগুলোকে কখনই কাজের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। কমিশন তার মতো করে নামমাত্র কখনও কোনো নীতি (পসিসি) নিলেও তার প্রণয়নের দায়িত্ব মূলত বর্তাতো সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের ওপর। ফলে অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা শব্দটা শুনতে গালভরা হলেও তা কার্যকর করা বাস্তবে কোনোদিনই সম্ভবপর হয়নি। এছাড়া অন্যান্য অন্তরায়ও ছিল।

আবুল কালামের গলদটা আর একটা জায়গায় ছিল। তাঁর শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষা আদপেই গুরুত্ব পায়নি। তা মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল স্কুলশিক্ষার সঙ্গে। আলাদা করে কোনও গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। তার ফল কী হয়েছে স্বাধীনতার এত বছর পরে ভারতবাসী হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। ভারতের মতো দারিদ্র-কবলিত দেশে প্রাথমিক শিক্ষাটুকুও বহু মানুষের নেই। এই অশিক্ষার হাত ধারেই কর্মসংস্থানে তাদের প্রতি বঞ্চনা, বৈষম্য প্রকট হয়েছে, একটা শ্রেণী তার সুযোগ সম্পূর্ণরূপে নিয়েছে। এখন কথায় কথায় আম্বানি- আদানিদের জুজু দেখানো হয়, আর এটা যারা দেখান তাদের রাজনৈতিক পূর্বসূরিরা ভারতবর্ষের মানুষকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তাদের ভাষাতেই বলি মানুষকে 'পুঁজির দাস' কেন বানানো হলো, কাদের স্বার্থে? সেটা জানার অধিকার কি দেশবাসীর নেই? তাদের 'দাস ক্যাপিটাল'-এর কোন অনুচ্ছেদে ক্রীতদাস তৈরির এই মহার্ঘ উপায় বর্ণিত আছে সেটা জানতে চাইলে তারা রীতিমতো তেড়ে আসবেন জানি, কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ দেবে মানুষের অসহায়তা, দরিদ্রতা এবং অশিক্ষার

সুযোগ নিয়ে দেশে দেশে ক্ষমতা কায়েমের রহস্যটা এখন 'ওপেন সিক্রেট'। স্বাধীনতার পর নেহরু সরকার যতই কমিউনিস্ট বিরোধিতার নাটক করুক এবং এটাও এখন সবাই জানেন নেহরু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক বিরোধী হতে পারেন। কারণ 'শুয়োরের খোঁয়াড়ে' তো আর যাই করুক গণতান্ত্রিক সহাবস্থান হয় না। কিন্তু মতাদর্শগতভাবে নেহরু একজন সাচ্চা কমিউনিস্টই ছিলেন এবং সরকারি শিক্ষানীতি তাঁর সরকার সেই ভাবেই প্রণয়ন করেছিল, শিক্ষামন্ত্রীর ভূমিকাটা এখানে নগণ্য।

নেহরু গত যাবার পর তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের এই উচ্চশিক্ষায় জোর আরও বাড়ে। কোনো সন্দেহ নেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি নিঃসন্দেহে উচ্চশিক্ষার ওপর নির্ভর করে। তবে এর মধ্যে সরকারের দেশের শ্রীবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা যত না ছিল, তার থেকেও বেশি ছিল নিজের নাম কেনার আকাঙ্ক্ষা যে, দেখ তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া একটা দেশ, তার সরকারের সুযোগ্য পরিচালনায় শিক্ষাব্যবস্থা কেমন উন্নতি লাভ করেছে! এতে ঘটেছে আরও বিপত্তি। দেহের সব রক্ত যেমন মুখে জমা হলে তাকে সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ বলা যায় না, তেমনি ১৯৬৪-৬৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি), কোঠারি কমিশন তৈরি হলেও প্রাথমিক শিক্ষার হাল অতি শোচনীয় থেকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। সরকার মুখে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেবার কথা বললেও তা যে নেহাত ছিল কথার কথা তা সবাই বুঝতে পেরেছিল। শিক্ষা-কমিশননের সুপারিশে শুধুমাত্র স্কুল শিক্ষা, যার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাও ছিল তা ১০+২ মাপকাঠিতে মান্যতা পেয়েছিল সর্বত্র। আবার ১০ বছরের মধ্যে চার বছর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ছিল। এতেও রয়ে গেছিল বহু গলদ, যেমন মাধ্যমিকের পর এখানে উচ্চমাধ্যমিকের স্তরকে এখন হাইস্কুল বলা হয়। আবার মহারাষ্ট্র সমেত কিছু রাজ্যে সেটাই 'জুনিয়ার কলেজ'। অবশ্য আগে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক স্তরকে প্রি-ইউনিভার্সিটি নামে অভিহিত করার চল ছিল। এগুলোর স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সময়ে বহু পরিবর্তন হয়েছে। তার ইতিহাস স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু একথা ঠিক প্রাথমিক শিক্ষা ও স্কুলশিক্ষায় পদ্ধতিগত কিছু সাম্য পরবর্তীকালে সাধিত হলেও নামের ফেরে ভিন রাজ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা গেলে তা জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। প্রত্যেক রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। যাই হোক, উচ্চশিক্ষায়, বিশেষ করে কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে আইআইটির মতো বিজ্ঞানশিক্ষার প্রথম সারির আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের যেমন জন্ম হয়েছে বা ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি) মাধ্যমে যেমন স্কুলশিক্ষায় কিছু সংস্কার করার চেষ্টা হয়েছিল। আবার একই সঙ্গে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় নামক সার্থকনামা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মধ্যে দিয়ে দেশদ্রোহী উৎপাদনের কারখানাও নির্মাণ করার চেষ্টা হয়েছিল, যে বিষবৃক্ষের ফল আজও ভারতের অভ্যন্তরীণ সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তুলেছে। জেএনইউ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যই ছিল রাষ্ট্রের বিরোধিতা, সঠিকভাবে বললে নেহরু পরিবারের ও নেহরুর মতাদর্শ (অর্থাৎ কমিউনিজম) কায়েম করা। যে কারণে বিরোধী মতাদর্শের পড়ুয়া জেএনইউতে বিশেষ করে আর্টস ফ্যাকাল্টিতে পড়লেও তার মতো কোনোদিনই গুরুত্ব পায়নি। বরং হাবেভাবে এটাই দেখানো হয়েছে, জেএনইউ ভারতবর্ষের তথাকথিত উচ্চশিক্ষার নিয়ন্ত্রক এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির মতো এককালের দেশপ্রেমী পড়ুয়া উৎপাদনের কেন্দ্রকেও সেই ছাঁচেই ঢালাই করা হয়েছে। এতে করে নেহরু পরিবার ও তার লেজুর কমিউনিস্ট সঙ্গীদের আরও একটা লাভ হয়েছে। ভারতের প্রকৃত ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জওহরলাল নেহরুর অপকীর্তি ও কমিউনিস্টদের নজিরবিহীন বিশ্বাসঘাতকতা থেকে দৃষ্টি ফেরাতে কমিউনিস্ট-সৃষ্ট মনগড়া দেশদ্রোহিতা-সূচক কাহিনিকে এবং দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের অপমানকারী, দেশের নবজাগরণের মনীষীদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টিকারী 'কৃত্রিম ইতিহাস আবিষ্কার'কেই মূলধারার ইতিহাস বলে এতকাল স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কংগ্রেস-সৃষ্ট তথাকথিত 'জাতীয় শিক্ষানীতি'র এটাই সবচেয়ে বড়ো বিপর্যয়।

যাইহোক, ১৯৬৮ সালে কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ও পরামর্শের ওপর ভিত্তি করে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন সাধন করে ও সেইসঙ্গে সংস্কারও করে। 'জাতীয় শিক্ষানীতি' বলতে যা বোঝায় তা না হলেও অন্তত সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে শিক্ষাক্ষেত্র এর ফলে পরবর্তী কিছুদিন পরিচালিত হতে পেরেছিল। কারণ এর কিছু সদর্থক দিক ছিল। ১৪ বছর পর্যন্ত শিক্ষা মৌলিক অধিকার, শিক্ষকদের শিক্ষাদানের প্রশিক্ষণ, শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে 'তিন ভাষা'— ইংরেজি, হিন্দি ও আঞ্চলিক ভাষাসূত্র ব্যবহার করা— এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করেছিল ইন্দিরা গান্ধীর সরকার। তবে এই সরকারের দৃঢ়তার অভাবে শেষোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে পরবর্তীকালে অনভিপ্রেত বিতর্কের জন্ম হয়েছে এবং আজ যাকে ব্যবহার করে মানুষের সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে জাতিদাঙ্গা তৈরির চেষ্টা হচ্ছে, দেশদ্রোহিতার নতুন আঙ্গিকও বোধহয় সৃষ্টি হচ্ছে। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত ভাষা হিসেবে ঠিক হয়েছিল ইংরেজির পর হিন্দিকেই শিক্ষার মাধ্যমের মাপকাঠি করা হবে 'সরকারি ভাষা' হিসেবে ঘোষণা করে, কিন্তু গুরুত্ব পাবে আঞ্চলিক ভাষাও। কিন্তু তৎকালীন সরকারের প্রচার-ব্যবস্থার গলদে প্রথমে দক্ষিণ ভারতে, আজ পশ্চিমবঙ্গে হিন্দিকে 'রাষ্ট্রভাষা' হিসেবে দেখিয়ে হিন্দি-বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে সুপরিকল্পিতভাবে। এছাড়াও কোঠারি কমিশনের সুপারিশ ও তার সরকারের কার্যকরী করার সদিচ্ছার মধ্যেও তফাত ছিল। কমিশন সংস্কৃতের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে সুপারিশ করেছিল। কিন্তু কংগ্রেস সরকারের ঔদাসীন্যে পরবর্তীকালে তা মৃতভাষায় পর্যবসিত। কমিশনের ক্ষমতা

সুপারিশ করা পর্যন্ত, কিন্তু তা কার্যকর করার দায়িত্ব সরকারের ঘাড়েই বর্তায়। ইন্দিরা গান্ধীর সরকার কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করার চেয়ে গতানুগতিতেই বেশি নজর দিয়েছিল। তাই ১০+২+৩ পদ্ধতি ব্যতীত কোঠারি কমিশনের গুরুত্ব এদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থায় আর সেভাবে বোঝা যায়নি।

মূলত কোঠারি কমিশনের সুপারিশ ব্যর্থ হওয়ার জন্যই রাজীব গান্ধীর আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় নীতি গ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়। সেই মোতাবেক ১৯৮৬ সালে তথাকথিত জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়। প্রধানত শিক্ষায় সমানাধিকার অর্থাৎ নারী শিক্ষা, তপশিলি জাতি-উপজাতিদের শিক্ষার বিষয় সুনিশ্চিত করাই ছিল এর প্রাথমিক লক্ষ্য। এবং দূরশিক্ষা-ব্যবস্থা লাগু করে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত (যার ফলে দূরশিক্ষায় দেশের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান ইগনু মানে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটির জন্ম) করা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের '৮৬ সালে গৃহীত জাতীয় শিক্ষানীতির আর সেরকম কোনো সার্থকতা নেই। পরে নরসীমা রাওয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে এর কিছু পরিবর্তন হয়।

এই মোটামুটি আমাদের জাতীয় শিক্ষার চালচিত্র। মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সচেষ্ট ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে 'জাতীয় নীতি' তৈরি করে তা অনুসরণ করার। গত ছ'বছরে এই নিয়ে কম আলাপ- আলোচনা হয়নি। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ২০১৫ সালে ৭-৮ নভেম্বরে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে জাতীয়তাবাদী ও পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ ছাত্র-সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় শিক্ষানীতি বিষয়ে দুদিনের একটি জাতীয় আলোচনাচক্র। এছাড়াও আরও অনেক আলাপ-আলোচনার পরই কেন্দ্র সরকার এনিয়ে সুচিন্তিত পদক্ষেপ করেছে।

এতে যথারীতি কমিউনিস্টরা শিক্ষাক্ষেত্রে গৈরিকীকরণের জুজু দেখছেন। তা দেখুন, তাতে আপত্তি নেই। কারণ এতদিনের সযত্নে লালিত ভারত ইতিহাসের মিথ্যার ওপর নির্মিত সৌধ ভেঙে পড়লে, তাদের এই হাঁসফাঁস অবস্থায় আশ্চর্যের কিছু নেই। বিশেষজ্ঞরা খুঁটিনাটি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবেন, কোনোটা খুব ভালো হলো, কোনোটা ততটা নয়। আইন পাশ হতে দিতে হবে দীর্ঘ সংসদীয় পথ পাড়ি। তবে এখনই হলফ করে বলা যায় কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে যেভাবে ভারতবর্ষের সব শিশুদের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর, তা বাস্তবায়িত করা গেলে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন ভারত অবিলম্বে নেবে। ভারতের বারো বছরের বিদ্যালয় শিক্ষা আগে যেখানে মোটামুটি তিনটি ভাবে বিভক্ত ছিল, সেখানে নতুন শিক্ষানীতিতে একে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে ছাত্র-ছাত্রীদের ভিতটা পাকাপোক্ত করার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রভূত সংস্কার করা হয়েছে উচ্চশিক্ষায়, দৈনিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে যা আপনারা ইতিমধ্যেই অবগত হয়েছেন।

সরকার কতটা সফল হবে, তা হয়তো আগামীদিনই বলবে। এই 'ভারতের জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন' কথাটা শুনলে কমিউনিস্টরা কেমন যেন অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন। সারা ভারতে ১.৫ শতাংশও ভোট নেই, মোদী সরকার যা শুরু করেছে, তাতে জেএনইউয়ের মৌরসিপাট্টাও গেল বলে! তাই অক্ষমের আর্তনাদের মতো 'জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন' কথাটার প্রতি কটাক্ষের, ব্যঙ্গের আবরণে বিষ উগরে দেওয়াই তাদের কাজ এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা তা করছেনও। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে, এক দেশ-এক শাসনব্যবস্থায় একটি জাতীয় শিক্ষানীতির বিশেষ তাৎপর্য আছে। এক দেশ, এক নীতি ইতিপূর্বে কোনো কেন্দ্রীয় সরকার চালু করতে পারেনি বলেই জাতীয় শিক্ষানীতি কথার কথা হয়েই থেকে গেছে। তাই মোদী সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতিকে সরকারের সামগ্রিক নীতির সঙ্গে আলাদা করে দেখা যাবে না। ভারতকে জগৎশ্রেষ্ঠ করার যে সামগ্রিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, জাতীয় শিক্ষানীতি তার একটি পদক্ষেপ মাত্র। এতে করে সবচেয়ে অসুবিধেয় পড়েছে ভারতকে যারা এক দেখতে চায় না, তারা 'টুকরে টুকরে' গোষ্ঠী হিসেবেই তাদের সবাই চেনেন। তাদের শয়তানি, দেশবিরোধী বুদ্ধি প্রথম ধাপেই বুঝে ফেলেছে এক দেশ এক নীতির লক্ষ্যেই কেন্দ্র সরকারের এই জাতীয় শিক্ষানীতি, আর তাতেই তারা প্রমাদ গুণেছে। দেশকে টুকরো করার কাজে না লাগলে, দেশকে অস্থির করার কাজে না লাগলে 'টুকরে' গোষ্ঠীটাই তো তুলে দিতে হয়। তাই অস্তিত্ব বিলোপের এই আশঙ্কা গৈরিকীকরণের ধুয়ো তুলতে বাধ্য করেছে তাদের। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

ভারতের শিক্ষানীতি ২০২০

হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের পথে

ড. সুজিৎ রায়

ভারত সরকার নতুন শিক্ষানীতি ২০২০ গ্রহণ করেছে। গত বছর ড. কে কস্তুরীরঙ্গন কমিটি খসড়া নতুন শিক্ষানীতি সরকারের কাছে পেশ করেছিল এবং তারপর সরকার সেই খসড়ার উপর মতামত আহ্বান করেছিল। সে সবের প্রেক্ষাপটেই আজকের আলোচনা।

জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৬৮ ও ১৯৮৬/১৯৯২-এর পরে এই শিক্ষানীতি ২০২০ হলো তৃতীয় শিক্ষানীতি, যা আগামী ২০ বছর কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। কস্তুরীরঙ্গন কমিটির বিভিন্ন প্রস্তাবের মূল নির্যাস ও রূপরেখা ভারত সরকার গ্রহণ করেছে। সেই প্রেক্ষিতেই এই নিবন্ধ।

প্রথমেই বলি, এই নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি সনাতন ভারতের গৌরবময় অতীতকে পুনরুদ্ধারের পথে এক দৃঢ় পদক্ষেপ। এতদিনের মেকলীয় শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীতে আবহমান ভারতীয় জীবনধারার মূল শিকড়ের সন্ধানে এই শিক্ষানীতি যেন এক দিকনির্দেশক পরিবর্তন--- এক পারাডাইমশিফট। শিক্ষাব্যবস্থার শুধু কাঠামোগত পরিবর্তন নয়, ভাবগত পরিবর্তনই এই নতুন শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য। জীবন সম্বন্ধে এক সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি তথা মূল্যবোধ যা ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রার মূলাধার, সেই মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করেই এই শিক্ষানীতি গৃহীত হয়েছে। এবার দেখা যাক, এই শিক্ষানীতির মূল দিকগুলো যা মূলত গড়ে উঠেছে ‘শিক্ষার্থীকেন্দ্রিকতার’ উপর ভিত্তি করেই।

প্রথমেই বিদ্যালয় শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের প্রসঙ্গে আসি। পুরনো ৬-১৬ বছর বয়সের সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্তে ৩-১৮ বছর বয়সের সকলের জন্য সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর জন্য সর্বজনীন শিক্ষা অধিকার আইন-২০০৯ সংশোধন করার কথা বলা হয়েছে। তবে, জৈবিক, শারীরিক এবং মানসিক উন্নতির ক্ষেত্রে শিশুর প্রথম তিন বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে শিশুর স্বাস্থ্যের অধিকারের সঙ্গে শিক্ষার অধিকারের সমন্বয় সাধন করা গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে অবশ্য অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থাকে সরাসরি শিশু শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে অঙ্গনওয়ারি ও আশাকর্মীদের শিশু শিক্ষার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে স্কুলের সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন।

বর্তমানের ১০+২ সিস্টেমের পরিবর্তে বিদ্যালয় স্তরে ৫+৩+৩+৪ শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে প্রথমে ৩-৮ বছর বয়সের শিশুদের জন্য ভিত্তিমূলক/

ফাউন্ডেশনাল শিক্ষা, তারপর ৮-১১ বছর বয়সের ছাত্রদের জন্য প্রস্তুতিমূলক/প্রিপারেটরি শিক্ষা, পরে ১১-১৪ বছর বয়সের ছাত্রদের জন্য মধ্য/মিডিল স্তরের শিক্ষা, আর শেষে ১৪-১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রদের জন্য সেকেন্ডারি শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতিতে 'বহুমুখী সমন্বয়মূলক' শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। যেখানে নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞান, কলা বা বাণিজ্য বিভাগের ব্যবস্থা থাকবে না। ছাত্র তার সামর্থ্য ও পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের বিষয়কে বেছে নিতে পারবে। এখানেই প্রত্যেক ছাত্রের 'সাইকোমেট্রিকপ্রোফাইল' তৈরি করা ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও দশম বা দ্বাদশ শ্রেণীতে সার্বিকভাবে পরীক্ষা না নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তবে বোর্ডগুলি 'কোর কমপিটেন্সি' যাচাই করতে পারবে। এক্ষেত্রে অন্তত দশম শ্রেণীর জন্য সর্বভারতীয় স্তরে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) দ্বারা এক সার্বিক পরীক্ষা নেওয়ার কথা ভাবা উচিত, যা ছাত্রদের এক সার্বিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার ভিত্তিতে কলেজ-স্তরে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলি এই মূল্যায়নকে ব্যবহার করতে পারবে। আর এই পরীক্ষা বিভিন্ন ভাষাতেই নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

এই নতুন শিক্ষানীতিতে বিদ্যালয় স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে শুধু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বললে ভুল বলা হবে, আসলেই সাধারণ জ্ঞানমূলক শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সমন্বয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে ছাত্ররা 'শ্রমের মর্যাদা' দিয়ে অন্তত একটি বৃত্তিমূলক ট্রেডে স্কিল বা দক্ষতা অর্জন করতে পারে। এখানেই প্রচীন ভারতের 'চৌষট্টি কলা'র কথা বলা হয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের শাস্ত্রে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে হতো। বিভিন্ন বিষয়ের সমাহার ও তার থেকে পছন্দের বিষয়গুলিকে অধ্যয়নের সুযোগ এই শিক্ষানীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

খসড়াতে যে 'স্কুল কমপ্লেক্স'-এর সুপারিশ করা হয়েছিল, তা এই শিক্ষানীতিতে গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্থানীয় স্তরে

> **বিদেশি শিক্ষানীতির অনুকরণে কেরানি তৈরির মানসিকতা স্বাধীনতার বহু বছর পরেও পুরোপুরি সমাপ্ত হয়নি। সেই কারণেই দেশে নতুন শিক্ষানীতির প্রয়োজন ছিল। এই নতুন শিক্ষানীতি স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন পূরণ করবে। স্বামীজী মনে করতেন, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সম্মিলিত এক শিক্ষানীতির প্রয়োজন। এতদিন পরে সেই উদ্যোগ শুরু হয়েছে।**

—স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ
উপাচার্য, রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়

বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের এবং শিক্ষক ও রিসোর্স আদান-প্রদানকে এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।

খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হচ্ছে সিলেবাস। এক্ষেত্রে এড়্সিইআরটি-কে একটি 'ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক ফর স্কুল এডুকেশন' তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে 'কোচিং ক্লাস কালচার'কে লোপ করতে 'ন্যাশনাল এসেসমেন্ট সেন্টার'-'পরখ' অর্থাৎ 'পারফরম্যান্স এসেসমেন্ট, রিভিউ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস অব নলেজ ফর হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট' তৈরি করা হচ্ছে, যাতে ছাত্রদের জ্ঞান ও বোধমূলক ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করা যায়, শুধু নোট-ভিত্তিক পড়াশোনা ও পরীক্ষা চালু না থাকে।

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তো এই শিক্ষানীতি বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে প্রকৃত ভারতীয়ত্বের মূলসুর তুলে ধরেছে এই শিক্ষানীতি। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষা, বাড়ির ভাষা, স্থানীয় ভাষাতে শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা শিক্ষার কথাও বলা হয়েছে। এতে 'বহুভাষিকতা'কেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, শুধু 'ইংরেজি এলিটিজম'কে বাদ দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে ভারতীয়ত্বের আধার সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, কারণ সংস্কৃত না জানলে ভারতের ঐতিহ্যকে জানা যায় না। একই সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় ভাষা, যেমন— পালি, প্রাকৃত এবং অন্যান্য ধ্রুপদী ভাষার প্রসার ও অনুবাদের জন্যও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। একই নীতি বিদেশি ভাষার ক্ষেত্রেও নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থী, শিক্ষণ-বিষয় ও শিক্ষক— এই তিনের মেলবন্ধন আবশ্যিক শর্ত। সেক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে ধারবাহিক প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন, পদোন্নতি ও পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা— এসবের উপরেই এই শিক্ষানীতি জোর দিয়েছে। 'জেনারেল এডুকেশন কাউন্সিল'-এর মাধ্যমে শিক্ষকদের জন্য একটা 'জাতীয় পেশাগত মান নির্ধারণ' করার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে ৪ বছরের শিক্ষা ও অন্য একটি বিষয় নিয়ে ইন্টিগ্রেটেডবিএড কোর্স চালু করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, উচ্চশিক্ষায় গবেষণা ক্ষেত্রে ভারতীয় 'গুরু-শিষ্য পরম্পরা' ধারায় মেন্টরিং-এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যার নাম হচ্ছে 'ন্যাশনাল মিশন ফর মেন্টরিং'। আবার, গবেষণার ক্ষেত্রে 'জাতীয় গবেষণা ফাউন্ডেশন' তৈরি করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা গবেষণা স্পনসরশিপের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের কথা বলা হয়েছে।

উচ্চতর শিক্ষা স্তরে ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন

ধরনের অপশন দেওয়া হবে। কলেজ স্তরে প্রতি বছরের সাপেক্ষেই শংসাপত্র দেওয়া হবে এবং একটা জাতীয় স্তরের 'অ্যাকাডেমি ক্রেডিট ব্যাঙ্ক' গড়া হবে যেখানে প্রতিটি ছাত্রের অধীত বিষয়গুলি তার ক্রেডিটে নথিভুক্ত থাকবে। মাঝখানে পড়া ছেড়ে দিতে হলেও পরে সেই ছাত্র ক্রেডিট সিস্টেমে আবার পরের ধার থেকেই শুরু করতে পারবে। ডিগ্রি কোর্সের ক্ষেত্রে ৩-৪ বছরের অপশন থাকবে, যাতে একজন ছাত্র যে কোনো একটি অপশন নিতে পারে, আবার পরে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির ক্ষেত্রে সেই অনুযায়ী ১-২ বছরের কোর্সে ভর্তি হতে পারে। ছাত্র-সহায়ক এমন পদ্ধতি আগে অকল্পনীয় ছিল, যা এই শিক্ষানীতি সম্ভব করে তুলেছে।

আর একটি বিষয়। উচ্চতর শিক্ষায় 'কোলাবোরেটিভ স্টাডিজ' খুব দরকার। যেমন, একই ক্লাসে দুই, তিন, চার বিষয়ের শিক্ষকদের একটি বিশেষ বিষয়ের উপর ক্লাস নেওয়ার শিক্ষা-পদ্ধতি চালু করা দরকার। তবেই এক সার্বিক তথা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠতে পারে। এখানেই ভারতীয় শিক্ষাধারায় 'চৌষট্টি কলা' অর্থাৎ সমস্ত ধরনের বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত চর্চার ইতিহাসকে এই শিক্ষানীতি মান্যতা দিয়েছে, যেখানে 'স্টেম'-সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যাথমেটিক্সকে— কলাশাস্ত্র ও কলাবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত করে সামগ্রিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। সমস্ত ধরনের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্রমশ মাল্টিডিসিপ্লিনারী ধরনের করে গড়ে তোলার দিকনির্দেশিকা এই শিক্ষানীতিতে দেওয়া হয়েছে।

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana®
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

শিক্ষা-প্রশাসনের ক্ষেত্রে এই নতুন শিক্ষানীতি 'কেন্দ্রায়িত বিকেন্দ্রীয়করণ' তথা 'ক্ষমতার বিভাজনের' নীতি অনুসরণ করেছে। সর্বোচ্চ স্তরে থাকছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'ভারতীয় উচ্চতর শিক্ষা কমিশন', যার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়-সাপেক্ষে চারটি পর্ষদ বা কাউন্সিল— (১) চিকিৎসা ও আইন শিক্ষা বাদে সমস্ত ধরনের শিক্ষার জন্য 'জাতীয় উচ্চতর শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, (২) সমস্ত উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাক্রিডিটেশন দেওয়ার জন্য 'জাতীয় অ্যাক্রিডিটেশন পর্ষদ', (৩) আর্থিক সহায়তার জন্য 'উচ্চতর শিক্ষা অনুদান পর্ষদ', ও (৪) উচ্চতর শিক্ষা-সংক্রান্ত মূল্যায়ণের জন্য 'সাধারণ শিক্ষা পর্ষদ'। অন্যান্য সমস্ত প্রোফেশনাল কাউন্সিলগুলি এই সাধারণ শিক্ষা পর্ষদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করবে। এর ফলে শিক্ষায় জাতীয় ভাবে এক সামগ্রিকতা গড়ে উঠবে।

অন্যান্য সব উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার ক্ষেত্রে এক সামগ্রিক নীতি-নির্দেশিকা রচনা করা হবে। তবে, সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত— গভর্নিং কমিটি/বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে ভারতের সংসদের রাজ্যসভার গঠন পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে, যাতে শিক্ষা-প্রশাসনে সর্বত্র স্তরে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

শিক্ষায় প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকার সারা দেশে প্রায় সমস্ত গ্রামেই বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে। সব শিক্ষাকেন্দ্রে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা এককথায় অপরিহার্য। কারণ বিদ্যুৎ ছাড়া অন্য সব শিক্ষা-প্রযুক্তি ব্যবস্থা প্রায় অচল। 'ন্যাশনাল এডুকেশনাল টেকনোলজি ফোরাম' গঠন করেই এডুকেশনকে সর্বস্তরের শিক্ষায় উপযুক্ত ভাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অবশ্য একই সঙ্গে উপযুক্ত রক্ষাব্যবস্থা করার জন্য এক সার্বিক তথ্য নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করাও জরুরি।

এই শিক্ষানীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে শিক্ষাকে 'পাবলিক গুডস ও সার্ভিস' অর্থাৎ 'সাধারণের পণ্য ও সেবা' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। তাই শিক্ষাকে বাণিজ্যকরণ থেকে বাঁচাতে সমস্ত স্তরেই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সর্বোচ্চ ফি নেওয়া থেকে শুরু করে প্রশাসনিক, আর্থিক ও শিক্ষার মান নিয়ে স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালনার কথা বলা হয়েছে।

সমাজের সমস্ত স্তরের সামাজিক-আর্থিক দিক থেকে অবহেলিত অংশ, বিশেষ ভাবে সক্ষম ছাত্র তথা কন্যা সন্তানদের জন্য এই শিক্ষানীতি বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছে। 'জেন্ডার-ইনক্লুসিভ ফান্ড' তৈরি করা হচ্ছে ছাত্রী ও ট্রান্সজেনডার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। আবার একই সঙ্গে 'বিশেষ শিক্ষা জোন'-এর কথা বলা হয়েছে, যেখানে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, 'বিশেষ প্রতিভাবান' ছাত্রদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যাতে 'ব্রেনগেইন' নিশ্চিত করা যায়।

সাধারণ শিক্ষা থেকে শুরু করে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা তথা বিশেষ ধরনের শিক্ষা, সামগ্রিক শিক্ষায় এক দিক পরিবর্তনের সূচনা করছে এই নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি। তার জন্য রাষ্ট্রগত ভাবে উপযুক্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে, সঙ্গে নীতি রূপায়ণের উপযুক্ত স্ট্রাটেজিও।

তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও পরিষ্কার নীতি নির্দেশিকার অবকাশ আছে। যেমন, ০-৬ বছরের শিশুদের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভূমিকা কী হবে, সংবিধান অনুযায়ী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই শিক্ষানীতির প্রয়োগ, সংবিধানের যৌথ তালিকায় থাকা শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির ভূমিকা, বিশেষত আর্থিক ক্ষেত্রে ইত্যাদি।

শেষে শুধু এটুকুই বলতে হয়, ঔপনিবেশিকতা তথা ধর্মবিশ্বাস-জনিত শিক্ষা-ব্যবস্থার অনুকরণশীলতা ও পশ্চাদমুখীনতার বেড়াজাল ভেঙে এই নতুন শিক্ষানীতি ভারতাত্মার মূল সুরকে আত্মস্থ করে আবহমান ভারতের হৃতগৌরবকে পুনরুদ্ধারের পথে এক আবশ্যিক পদক্ষেপ। ■

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০

এক যুগোপযোগী পদক্ষেপ

রামানুজ গোস্বামী

"Education is the manifestation of the perfection already in man."—Swami Vivekananda

ভারতকে বিশ্বের দরবারে এক অতি উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিরাম গতিতে কাজ করে চলেছে মোদী সরকার। রাজনৈতিক ক্ষেত্র, অর্থনৈতিক সংস্কার, পররাষ্ট্রনীতি, সামরিক ক্ষেত্র ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুযোগ্য ও ঐতিহাসিক নেতৃত্বে ভারত আজ এগিয়ে চলেছে সারা পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকারের দিকে। সাম্প্রতিককালে ভয়ংকর অতিমারীর সময়েও ভারত পৃথিবীকে এক বিপদ থেকে বেরিয়ে আসবার পথ দেখাচ্ছে। পৃথিবীর অতি উন্নত দেশগুলিতে যখন অতিমারীতে মৃত্যুহার ভয়ংকর বেশি, তখন এত জনবহুল ও ঘনবসতিপূর্ণ এই ভারতে মৃত্যুহার সবচেয়ে কম। এটা সম্ভব হয়েছে মোদীজীর বিচক্ষণ ও সুচিন্তিত পদক্ষেপের কারণেই। এই সংকটকাল অতি শীঘ্রই কেটে যাবে, আমরা এই আশা রাখি। আগামীদিনে ভারতই হবে বিশ্বের পথপ্রদর্শক। এই লক্ষ্যে ভারত সরকারের আরও একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হলো 'জাতীয় শিক্ষা-নীতি-২০২০', যা নিঃসন্দেহে বিশ্বের দরবারে ভারতকে অনেকটাই এগিয়ে দেবে। শিক্ষাই হলো একটি জাতির মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ড সোজা, সুস্থ ও দৃঢ় না হলে শায়িত অবস্থাই হয়ে পড়ে একমাত্র ভবিষ্যত। একইভাবে, যথার্থ শিক্ষা না থাকলে, জাতির

CREDIT : PTI

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে শুধুমাত্র শিক্ষিত ভারতীয়ই তৈরি হবে না, উপরন্তু তৈরি হবে আদর্শ মানুষ। এর ফলেই মানুষের অন্তরের পূর্ণত্বের যথার্থ বিকাশ ঘটবে। এই ভাবেই শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামীজীর স্বপ্ন ও আদর্শ বাস্তবায়িত হবে।

প্রকৃত তথা সামগ্রিক উন্নতি হয় না। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই এবারের এই শিক্ষানীতির প্রস্তাব করা হয়েছে।

ভারতে সর্বশেষ শিক্ষা-নীতি বলতে বোঝায় ১৯৮৬ সালের শিক্ষানীতকে, যা ১৯৯২ সালে আবার পরিমার্জিত হয় (NPE 1986/92)। মনে রাখা দরকার যে, এই প্রায় সাড়ে তিন দশকে দেশ তথা সমাজজীবনে ব্যাপক মাত্রায় পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। তাই অনেক আগেই প্রয়োজন ছিল যুগোপযোগী একটি নতুন শিক্ষানীতির, যা ভারতের আগামীদিনের শিক্ষার্থীদের করে তুলবে একই সঙ্গে ভারতের ঐতিহ্য, পরম্পরা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারায় স্নাত। ভারতের এতদিনের প্রচলিত শিক্ষানীতিতে এই একটি মস্ত বড়ো ফাঁক ছিল বা অভাব ছিল। বর্তমান শিক্ষানীতি সেই অভাবকেই পূরণ করল। এর ফলে একজন শিক্ষার্থী শুধু শিক্ষিতই হবে না— সে হবে একজন প্রকৃত ভারতীয়, যে হবে নতুন ভারত গঠনের সৈনিক।

এই ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি মনে আসে, তাহলো এই যে, বিগত দিনের শিক্ষানীতিগুলিতে এমন কী ছিল যার জন্য এই নতুন শিক্ষানীতি ছিল অত্যন্ত জরুরি? এই বিষয়ে গোড়াতেই বলে রাখা ভালো যে, এই নতুন শিক্ষানীতি এদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের ভারতীয় ধারায় ভাবতে শেখাবে, বিদেশি বা তাদের স্বার্থানুকূল্যে

পরিপুষ্ট এদেশের কিছু তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত, দেশবিরোধী ও রাষ্ট্রভক্তিবিহীন ব্যক্তির চোখ দিয়ে শিক্ষার্থীরা আর নিজেদের মাতৃভূমিকে দেখবে না। এই কারণেই প্রয়োজন ছিল সংশোধিত এই নতুন শিক্ষাক্রম তথা শিক্ষানীতির। এই বিষয়ে নতুন শিক্ষানীতিতে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, "The rich heritage of ancient and eternal Indian knowledge and thought has been a guiding light for this Policy. The pursuit of knowledge (Jnan), wisdom (Prajna) and truth (Satya) was always considered in Indian though and philosophy as the highest human goal. The aim of education in ancient India was not just the acquisition of knowlege as preparation for life in this world or life beyond schooling, but for the complete realization and liberation of the self...Indian culture and philosophy have had a strong influence on the world. These rich legacies to world heritage must not only be nurtured and preserved for posterity but also researched, enhence and put to new uses through our education system."

তাই, এইকথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, ভারতকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে অভিষিক্ত করবার যে মহান লক্ষ্যে নরেন্দ্র মোদী কাজ করে চলেছে, এই নতুন শিক্ষানীতি তারই একটি অঙ্গ। এর উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে— "The vision of the policy is to instill among the learners a deep-rooted pride in being Indian, not only in thought, but also in spirit, intellect and deeds as well as to develop knowledge, skills, values and dispositions that support responsible commitment to human rights, sustainable development and living and global, well-being thereby reflecting a truly global citizen."

প্রকৃত শিক্ষানীতি হলো সেটাই যা একেবারে শিশু অবস্থা থেকে শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নতিতে সাহায্য করে। এই নতুন নীতিতে সেই বিষয়ে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একেবারে প্রাথমিক বা বলা ভালো প্রাক্-প্রাথমিক স্তর থেকেই একজন শিক্ষার্থীর বহুমুখী প্রতিভার যাতে সঠিক বিচ্ছুরণ ঘটে, সেই বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে এবারের শিক্ষানীতিতে। সর্বোপরি, শিক্ষা যাতে কখনই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বোঝাস্বরূপ হয়ে না দাঁড়ায়, বরং তা যেন হয় উপভোগ্য, আনন্দদায়ক ও জ্ঞানার্জনের স্পৃহা বর্ধনকারী, সেই ব্যাপারটির দিকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই খেলাচ্ছলে শিক্ষাদানের বিষয়টি এবারে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তাছাড়া, একেবারে অঙ্গনওয়াড়ি স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাস্তর পর্যন্ত

> **ভবিষ্যতে শিক্ষাকে কর্মসংস্থান কেন্দ্রিক করে তোলার প্রয়াসে এই শিক্ষানীতি যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। এই শিক্ষানীতি অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পছন্দের বিষয় নিয়েও পড়াশোনা করতে পারবে। ২০২০-র জাতীয় শিক্ষানীতি ছাত্র-ছাত্রীদের সেই সুযোগ করে দেওয়ার পথ অবশ্যই প্রশস্ত করেছে।**
>
> **—অধ্যাপক অম্বুজ মহাপাত্র**
> পূর্বতন ডিন, আইআইএম, জোকা

পরিকাঠামো ও আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রের মানোন্নয়নের দিকটির প্রতি এবারে সরকার বিশেষ দৃষ্টিপ্রদান করেছেন। পাঁচ বছর বয়সের আগে প্রতিটি শিশুকে একটি প্রিপারেটরি ক্লাস বা বালবাটীকায় (প্রথম শ্রেণীর পূর্বে) যাওয়া নিশ্চিত করবার কথাও এক্ষেত্রে বলা হয়েছে। এতে শিশুর শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের দিকটির প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। তাছাড়া, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নানা সময়ে বিভিন্ন রকম যুগোপযোগী ও আধুনিক প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে। সরকারের সর্বোচ্চ প্রাধান্য হলো এটিই যাতে ২০২৫ সালের মধ্যে সমস্ত শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতাভুক্ত করা যায় এবং বলাই বাহুল্য যে, মোদী সরকার এই লক্ষ্য পূরণে বদ্ধপরিকর।

এই নীতির প্রতিটি ধারা ধরে ধরে আলোচনা করাটা এই সীমিত পরিসরে সম্ভব নয়। তাই এবারে একটু অন্য দিকে আসা যাক। আমাদের এট বুঝতে হবে যে, এই শিক্ষানীতি একুশ শতকের ভারতের চাহিদা মেটানোর কাজ করবে। তাছাড়া, এটা মনে রাখা দরকার যে, যুবসমাজের যে লক্ষ্য, আদর্শ ইত্যাদি থাকে বা যে চাহিদা থাকে, তাকেও মেটাতে পারবে এই নতুন শিক্ষানীতি। এই জাতীয় শিক্ষনীতি শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র বইমুখী শিক্ষায় উৎসাহিত বা সীমিত করে রাখবে না। পাঠ্যক্রম হবে চিত্তাকর্ষক (পাঠ্যক্রমের বোঝাও কমবে) ও ছাত্র-ছাত্রীরা হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করবে। পাশাপাশি, একস্ট্রা বা কো-ক্যারিকুলার গুণবলীর বিকাশেও এই নীতিতে যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারতের জাতীয় আয়ের শতকরা ছয় ভাগ শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়িত হবে, যা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই শিক্ষানীততে কেন্দ্রীয় সরকার দায়বদ্ধতা স্বীকার করেছে সকলকে শিক্ষায় সংযুক্ত করার বিষয়টিতে; ফলে শিক্ষার অধিকার হবে সুরক্ষিত। কংগ্রেসি আমলে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক নাম বদলে হয়েছে শিক্ষামন্ত্রক, যা একটি বাস্তবোচিত পদক্ষেপ।

এই যুগ হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত দিকটিকে

এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মনে রাখা দরকার, এখন থেকে আর শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় পাশ করে একটি চাকরির জন্য যাতে অপেক্ষা করে থাকতে বাধ্য না হয়, তার জন্য এবারের শিক্ষানীতিতে অত্যন্ত জোর দেওয়া হয়েছে। এই নীতি শুধুমাত্র কর্মপ্রার্থী তৈরি করবে না, এতে বৃদ্ধি পাবে কর্মদাতার সংখ্যাও। তাই বৃদ্ধি পাবে কর্মসংস্থান। ২০৩০ সালের মধ্যে সমস্ত শিক্ষার্থীকে সেকেন্ডারি লেভেলের আওতায় নিয়ে আসাই ভারত সরকারের লক্ষ্য। তাছাড়া, ভোকেশনাল শিক্ষায় যেহেতু সামগ্রিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তাই বাড়বে স্বনির্ভর ব্যক্তি তথা গোষ্ঠীর সংখ্যা। সার্বিক ভাবে দেশ হবে আত্মনির্ভর। এই ভাবেই কয়েক বছরের মধ্যেই 'আত্মনির্ভর- ভারত' নামক যে প্রকল্পের কথা মোদীজী ঘোষণা করেছেন, তা হবে সফল ও বাস্তবায়িত।

একটা কথা না বললেই নয়, এই নতুন নীতি একদিকে মুক্ত চিন্তার বাহক এবং অন্যদিকে ভারতের মতো দেশের ক্ষেত্রে যথেষ্টই অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের মতো চিরকালীন শ্রেণীবিভাগ করাও এই নতুন নীতিতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাই একজন শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছামতো বিষয় বেছে নিয়ে পড়তে পারবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, একজন শিক্ষার্থী অঙ্কের বা গণিতের সঙ্গে দর্শনও পড়বার সুযোগ পেতে পারবে। উন্নত বিশ্বের বহু দেশে এই ধারা বহুদিন ধরেই প্রচলিত। এই শিক্ষানীতির উপর একটি বাস্তবোচিত পদক্ষেপ হলো অ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্ক অব ক্রেডিট। ভারত একটি উন্নয়নশীল দেশ। এই দেশে আজও মূলত আর্থিক কারণেই বহু ছাত্র-ছাত্রীকে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হয়। তাদের সাহায্য করবে এই ব্যাঙ্ক। উল্লেখ্য যে, সাম্মানিক স্নাতক কোর্স হতে চলেছে চার বছরের। কিন্তু কোনো শিক্ষার্থী এক বছর সম্পূর্ণ করলে পাবে সার্টিফিকেট, দ্বিতীয় বছর ডিপ্লোমা, তৃতীয় বছরে ডিগ্রি এবং চতুর্থ বছরে সে সাম্মানিক স্নাতক হতে পারবে। যদি কেউ কোর্সের মাঝপথে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং পরবর্তীকালে আবার লেখাপড়া করতে চায়, তো তাকে আবার নতুন করে ভর্তি হতে হবে না, সে যেখানে ছেড়েছিল, তারপর থেকেই সে আবার শুরু করতে পারবে। তার সমস্ত তথ্য জমা থাকবে ওই ব্যাঙ্কে। তাছাড়া দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশ্বমানের করে গড়ে তোলাও সরকারের একটি লক্ষ্য। তাই দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে (বিশেষত গবেষণার ক্ষেত্রে) এক আন্তর্জাতিক এবং অতি উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়ার কথাও এই নীতিতে ঘোষিত হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে বিশ্বের বিখ্যাত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থী আদান-প্রদানের বিষয়টিও, যাতে ভারত শিক্ষার নানা ক্ষেত্রে 'বিশ্বগুরু' রূপে প্রতিভাত হয়। একইভাবে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক আদান-প্রদানের বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে আরও বেশি পরিমাণে বৃত্তি পেতে পারে, থাকছে তার ব্যবস্থাও। ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত যাতে আদর্শ হতে পারে, সেদিকেও সরকার দায়বদ্ধতা স্বীকার করেছেন। একই সঙ্গে সকলকে উচ্চশিক্ষা প্রদানের কথাটিও সরকার স্বীকার করেছেন।

এক্ষেত্রে আরও একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো বহুবিধ নিয়ন্ত্রক সংস্থার বদলে শিক্ষাক্ষেত্রে দেশে একটিই সংস্থা সৃষ্টি করা,

এতদিন জিডিপি-র ১ শতাংশেরও কম গবেষণা খাতে বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্র সরকারের নয়া শিক্ষানীতিতে সেই আর্থিক সংস্থান বৃদ্ধির ইঙ্গিত মিলেছে। বিদেশের তুলনায় ভারত মোটেই পিছিয়ে নেই। আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তুলতে এই নতুন শিক্ষানীতি অনুঘটকের কাজ করবে।

— ভি কে তিওয়ারি
অধিকর্তা, খড়্গপুর আইআইটি

নতুন শিক্ষানীতিটি আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন, গরিব ছাত্র-ছাত্রীরা যদি শিক্ষার কাছে পৌঁছতে না পারে তাহলে শিক্ষাকে তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

—ড. মল্লিনাথ মুখোপাধ্যায়
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর,
অর্থনীতি বিভাগ
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ

যাতে নিয়ন্ত্রণ হয় সহজসাধ্য, সমস্ত ক্ষেত্রে যোগাযোগ হয় সুষম এবং সর্বোপরি থাকে স্বচ্ছতা। এই সংস্থার নাম হবে হায়ার এডুকেশন কমিশন অব ইন্ডিয়া। এছাড়া, শিক্ষা যাতে বেসরকারি ক্ষেত্রে ব্যবসায় পরিণত হয়ে না যায়, তার দিকেও এই নীতিতে স্পষ্ট ভাষায় নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে। সর্বোপরি বলা হয়েছে যে, শিক্ষা হবে বিশ্বমানের কিন্তু তার ভিত্তি হবে ভারতীয় সনাতন জ্ঞান- বিজ্ঞান, আদর্শ, চিন্তা-ভাবনা, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে এক্ষেত্রে অত্যন্ত জোর দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে ভারতের ধ্রুপদী ভাষাগুলির আরও উন্নতিসাধন কীভাবে করা যায়, তা নিয়েও আছে বিস্তারিত ব্যাখ্যা। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধনের লক্ষ্যে 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' প্রকল্পটিতেও অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশনের বিষয়েও জোর দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার যে কোনও স্তরেই ভাষা শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তবে শিশুর ক্ষেত্রে মাতৃভাষাই শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হওয়া উচিত। এক্ষেত্রেও অন্তত পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদানের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া প্রাথমিকে মাতৃভাষা ছাড়াও আরও দুটি ভাষার শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে। এতে পরবর্তী ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সুবিধাই হবে।

যে কোনও নীতিই রূপায়ণের সফলতার উপরে বহুলাংশে নির্ভর করে। সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলির রয়েছে যথেষ্ট দায়িত্ব। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এই বিষয়ে অন্যান্য বহু বিষয়ের মতোই তথৈবচ ও হতাশাজনক। শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই এই রাজ্যের সরকার নানাভাবে এই নতুন শিক্ষানীতির বিরোধিতা করে চলেছে। অথচ এই নীতি বাস্তবায়িত হলে এই রাজ্যের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ জীবনে দারুণভাবে সফল হবে। তাই এক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে এই রাজ্যের সরকারের কর্তব্য হলো কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতি অবিলম্বে বাস্তবায়িত করা। একদা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু আজ তা গভীর সংকটের মধ্যে রয়েছে। নতুন শিক্ষানীতি পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে দেবে।

সীমিত পরিসরে জাতীয় শিক্ষানীতির মতো এত বড়ো বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবু এই নীতির প্রধান বিশিষ্ট্যগুলি প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হলো। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী এই জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। এতে তিনি যা বলেছেন, তার একটি সারমর্ম যদি আমরা পর্যালোচনা করি তবে আমরা দেখব যে—

(ক) এতে ৩-৪ বছর ধরে লক্ষ লক্ষ প্রস্তাব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার পরই শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

(খ) এই শিক্ষানীতিতে একতরফা ভাবে কিছুই ঘোষণা করা হয়নি।

(গ) প্রতিটি দেশের শিক্ষানীতিতে সেই দেশের ন্যাশনাল ভ্যালু বা জাতীয় মূল্যবোধ ইত্যাদি প্রসঙ্গে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই নতুন শিক্ষানীতিও সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে।

(ঘ) এই শিক্ষানীতি একুশ শতকের নতুন ভারতের ফাউন্ডেশন বা ভিত্তি গড়ে দেবে।

(ঙ) এই নতুন শিক্ষানীতিতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই সমৃদ্ধ হবেন।

(চ) একদিন যে পুরনো ধারায় শিক্ষাব্যবস্থা চলেছে, তাতে What to think এই বিষয়টির উপরেই কেবলমাত্র গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বর্তমান নতুন শিক্ষানীতিতে জোর দেওয়া হয়েছে How to think এই বিষয়টির উপরে। ফলে, শিক্ষাব্যবস্থ হবে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত। পাশাপাশি, কর্মসংস্থানমুখী শিক্ষার (Job oriented education) বিষয়েও এই নীতিতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই প্রবন্ধের শুরু হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের একটি অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ উক্তির দ্বারা। এটা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে শুধুমাত্র শিক্ষিত ভারতীয়ই তৈরি হবে না, উপরন্তু তৈরি হবে আদর্শ মানুষ এবং এর ফলেই মানুষের অন্তরের পূর্ণত্বের যথার্থ বিকাশ ঘটবে। এই ভাবেই শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামীজীর স্বপ্ন ও আদর্শ বাস্তবায়িত হবে। তাই ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ হলো প্রকৃত অর্থেই সেই যুগোপযোগী পদক্ষেপ, যা গড়ে তুলবে অজেয় ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত , অমর ভারত। ■

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

ভারতের শিক্ষানীতি ২০২০

উন্নত ভারতের দিক্‌নির্দেশ

রবি রঞ্জন সেন

স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশে অনেক শিক্ষা কমিশন, কমিটি গঠন হয়েছে অথচ আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঔপনিবেশিক কাঠামো থেকে মুক্ত করে ভারতকেন্দ্রিক শিক্ষা গড়ার কাজকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারিনি। ১৯৮৬ সালের শিক্ষানীতির পর দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে ভারতে আর কোনো নতুন শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি। ইতিমধ্যে পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে, অনেক নতুন বিষয় এসেছে, নতুন প্রযুক্তি এসেছে, এসেছে নতুন চিন্তাভাবনা। ২০১৭ সালে ইসরোর প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. কে কস্তুরী রঙ্গনের নেতৃত্বে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটি কমিটি ভারত সরকার গঠন করে। এই কমিটি দুই বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে একবিংশ শতাব্দীর জন্য উপযুক্ত শিক্ষা নীতির খসড়া তৈরি করে ৩১ মে ২০১৯-এ তা সরকারের হস্তগত করে। এই সময়কালে এই কমিটি প্রায় দুই লক্ষ শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, বিদ্যার্থী, অভিভাবকদের থেকে মতামত সংগৃহীত করে। এত বৃহৎ আকারে মানুষের মতামত নিয়ে তার প্রত্যেকটির উপর বিচার-বিমর্ষ করে দেশের শিক্ষানীতি নির্ধারণ ইতিপূর্বে কোথাও হয়নি। এই কমিটির প্রতিবেদনই গত ২৯ জুলাই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেট দ্বারা অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হলো জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ রূপে।

ঘোষণার পর থেকেই এই নীতির বিভিন্ন প্রস্তাব সম্পর্কে সমস্ত মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। প্রায় সকলেই এই নীতিকে অত্যন্ত ইতিবাচক ও ভবিষ্যদ্‌মুখী দিকনির্দেশ

হিসেবে স্বাগত জানিয়েছে যদিও কিছু রাজনৈতিক ও অন্যান্য মহল থেকে সমালোচনাও শোনা গেছে। তবে অধিকাংশ শিক্ষাবিদদের মত অনুসারে এই নীতি একদিকে ভারতের সনাতন ঐতিহ্য, তার জ্ঞান পরম্পরা, তার মূল্যবোধ ও চরিত্রগঠনমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন ও এই সমস্ত বিষয়গুলিকে পঠনপাঠনের অন্তর্ভুক্ত করছে। অপরদিকে নতুন বিশ্বায়িত জগতের সঙ্গে তাল রাখার জন্য যে ধরনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, পরিকাঠামো ও পাঠ্য বিষয়সমূহের প্রয়োজন সেগুলিকেও শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করছে। জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সত্যের আদর্শকেই নীতির সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। নীতির খসড়ার প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রাচীন ও সনাতন ভারতীয় জ্ঞান ও চিন্তা এই নীতি নির্ধারণে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছে। প্রাচীন ভারতের তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা, বল্লভির উল্লেখ, চর্চা এবং সেই জ্ঞানকেন্দ্রগুলির থেকে শেখার কথা এই নীতির মধ্যে বারবার উঠে এসেছে। মৈত্রেয়ী, গার্গী থেকে শুরু করে ভারতীয় বিদ্বান ও বিদুষীগণের উল্লেখও করা হয়েছে।

শিক্ষাব্যবস্থার এই মৌলিক সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দুতে শিক্ষককে রাখা হয়েছে। কারণ যে কোনো শিক্ষানীতির সাফল্যের চাবিকাঠি শিক্ষকসমাজের হাতে। শিক্ষকরাই সমাজজীবনে সবচাইতে সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ, যদিও বিগত কয়েক দশকে বিভিন্ন কারণে এই সামাজিক সম্মান হ্রাসমান। এই নীতি শিক্ষকদের পুনরায় সেই সম্মানের স্থানে বসানোর কথা বলে ও তাঁদের সশক্তিকরণের কথা বলে। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সকল স্তরেই শিক্ষকদের যথেষ্ট প্রশিক্ষণ, প্রস্তুতি ও কর্মক্ষেত্রে তাঁদের সঠিক পরিকাঠামো প্রদানের কথা বলে। আর তাই বি.এড-কে স্নাতক পাঠ্যক্রমের সঙ্গে একত্রিত করে চার বছরের কোর্সে পরিণত করা হচ্ছে। এছাড়াও স্পষ্টভাবে বলা আছে যে পড়ানো ছাড়া অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় দায়িত্ব বিশেষ করে নির্বাচনের দায়িত্ব শিক্ষকদের দেওয়া যাবে না।

ছাত্রদের জন্য সর্বস্তরে উন্নত গুণমানের শিক্ষার অঙ্গীকার এই শিক্ষানীতির মধ্যে আছে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য প্রকৃত মানুষ নির্মাণ এবং এই আদর্শের আলোকেই যে এই নীতি প্রস্তুত করা হয়েছে তা খসড়ার প্রথমেই বলা হয়েছে। সমগ্র পাঠ্যক্রম ও পঠনপাঠনের মাধ্যমে এই দেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা উৎপন্ন করার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়াও শিক্ষাব্যবস্থা যাতে 'লেভেলার' রূপে কাজ করতে পারে অর্থাৎ সকল শ্রেণী, জাতি, অঞ্চল প্রভৃতি ভেদাভেদ নির্বিশেষে যাতে সকল ছাত্র-ছাত্রীর সমান ধরনের উচ্চগুণমান-সম্পন্ন শিক্ষা দেওয়া যায় তার কথা এই নীতির মধ্যে আছে। তাই এখানে স্পষ্ট বলা আছে যে, এই নীতির সমস্তটাই সরকারি ও বেসরকারি উভয়

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। ইতিপূর্বে আমরা দেখে অভ্যস্ত যে, সমাজের উচ্চবিত্তদের ছেলে-মেয়েদের জন্য একধরনের শিক্ষাব্যবস্থা বেসরকারি কনভেন্ট ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঘিরে এবং সাধারণদের জন্য আরেক ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা সরকারি স্থানীয় ভাষামাধ্যম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করে। এই বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে দূর করার কথা এই নীতির মধ্যে আছে।

সকল শিশুর জন্যই তিন বছর বয়স থেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণের পর্ব শুরু করার কথা বলা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর পূর্বের এই তিন বছর, শিশুকে বিভিন্ন খেলা ও খেলনার মাধ্যমেই শিক্ষার ভিত স্থাপন করা হবে। এই সময়ে শিশুর পুষ্টি ও শারীরিক বিকাশের উপরও জোর দেওয়া হবে। মিডডে মিল ছাড়াও প্রাত্যহিক পুষ্টিকর জলযোগের ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে। বর্তমানে ৬-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এর আওতা বৃদ্ধি করে ৩-১৮ পর্যন্ত করা হয়েছে এবং বিদ্যালয় স্তরকে ভাগ করা হয়েছে ৫+৩+৩+৪ অর্থাৎ চারটি পর্যায়ে। শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশের ৮৫ শতাংশ আট বছর বয়স পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তাই এই সময়েই নতুন ভাষা শেখা তার পক্ষে সহজ হয়। তাই এই নীতিতে প্রথম থেকেই ত্রিভাষা সূত্রের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ মাতৃভাষা/স্থানীয় ভাষা ছাড়াও আরও দুটি ভাষা শেখানো হবে যার চয়ন নির্ভর করবে রাজ্য সরকার ও ছাত্রদের উপর। সারা বিশ্বের অধিকাংশ গবেষণাই আমাদের জানাচ্ছে যে, শিশুদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো পঠনপাঠন হয় নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে। তাই এই নীতিতে বলা হয়েছে যে অন্তত পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এবং সম্ভব হলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা/আঞ্চলিক ভাষা হবে। আরও স্পষ্ট করা হয়েছে যে এই নীতি সরকারি-বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। বলা বাহুল্য, মাধ্যম মাতৃভাষা হলেও অন্য কোনো ভাষা ভালোভাবে শেখার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই, বরং তিনটে ভাষাই, যার মধ্যে অন্তত দুটি ভারতীয় ভাষা রাখতে হবে, ভালোভাবে শেখা বাধ্যতামূলক হবে।

ভারতের জ্ঞানপরম্পরা স্পর্শ করার মাধ্যম সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃতের চর্চা প্রোৎসাহিত না করলে এই বিশাল ও সমৃদ্ধ জ্ঞানপরম্পরা হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল, আর যদি তা হয় তাহলে শুধু ভারতবর্ষ নয় সমগ্র মানবসভ্যতার ক্ষতি। তাই সংস্কৃতশিক্ষাকে সর্বস্তরে সংযুক্ত করা হয়েছে ত্রিভাষা সূত্রের একটি বিকল্প ভাষা হিসেবে। অবশ্য কোনো ভাষাকেই বাধ্যতামূলক করা হয়নি, বলা হয়েছে সংস্কৃত বিকল্প হিসেবে থাকা বাধ্যতামূলক কিন্তু সেটাকে চয়ন করার বা না করার স্বাধীনতা ছাত্রের। এছাড়াও ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে ‘ভারতের ভাষা’ নামক একটি পাঠ্যক্রম থাকবে যেখানে ভারতের সমস্ত ভাষা, তাদের উৎস ও সাহিত্যসম্ভার সম্বন্ধে শেখা যাবে এবং সব ভাষায় প্রাথমিক কিছু বাক্যবিনিময় শেখানো হবে। সমস্ত ভারতীয় ভাষাকে প্রোৎসাহিত ও বিকশিত করার জন্য বলা হয়েছে যে প্রাথমিক থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত পেশামূলক ও প্রযুক্তিমূলক শিক্ষা-সহ সকল শিক্ষাই ভারতীয় ভাষায় উপলব্ধ হবে ও বিশ্বের সাম্প্রতিকতম গবেষণাগুলিকে সব ভাষায় অনুবাদ করার জন্য একটি উন্নতমানের সংস্থা গঠন করা হবে। এই সদর্থক নীতির ফলে আশা করা যায় যে অল্পসংখ্যক ইংরেজি বলা মানুষের বাইরে যে বিপুল প্রতিভাসম্ভার আমাদের দেশে সুযোগের অভাবে লুকিয়ে আছে, সেই সমস্ত প্রতিভাগুলিকে বিকশিত করতে ও সামনের সারিতে আনতে এই নীতি ফলপ্রসূ হবে।

তবে এই শিক্ষানীতির সমস্ত প্রস্তাবগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে মূলকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে মূল শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যাবে। এতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের পেশার থেকে শিক্ষাব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ শাসকদের প্রবর্তিত শিক্ষানীতি যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শুধু কেরানি তৈরি করা, তার রেশ স্বাধীনতার এত বছর পরও রয়ে গেছে। এর ফলেই আমাদের দেশে কর্মসংস্থানের সমস্যা এত অধিক। এই বস্তাপচা চিন্তাভাবনাকে অবশেষে বিসর্জন দিয়ে আমরা আমাদের শিক্ষাকে মানুষের পেশার সঙ্গে যুক্ত করতে চলেছি। কামার, কুমোর, ছুতোর, কৃষক, মালী, বিদ্যুৎ মিস্ত্রী প্রভৃতি পেশায় নিযুক্ত দক্ষ কারিগরদের থেকে যে কোনো একটি বৃত্তিমূলক পেশা শিখে পারদর্শী হবার সুযোগ ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দেওয়া হবে। এতে আমাদের যুবসমাজের জন্য স্বরোজগারের পথ খুলে যাবে ও তার সঙ্গে স্কুলছুটের হারও হ্রাস পাবে। কারণ স্কুলে প্রাপ্ত শিক্ষা নিজেদের জীবন, জীবিকা ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বোধ হবে। আবার যারা বিষয় হিসেবে বৃত্তিমূলক পেশা বেছে নেবে না সেই ছাত্র-ছাত্রীদেরও অন্তত দশ দিন বাধ্যতামূলকভাবে কোনো একটি পেশার মানুষের কাছে তাদের কাজ সম্বন্ধে শিখতে হবে। অর্থাৎ এই নীতি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে ডাক্তার, অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ারদের ছেলে-মেয়েরাও অন্তত কটাদিন এই কামার, কুমোরদের সঙ্গে কাটাবে, তাদের পেশা সম্বন্ধে জানবে, অনুভব করতে শিখবে যে এই সমস্ত কাজেও কেবল কায়িক শ্রম নয়, কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই শিক্ষা যেমন একদিকে সমাজজীবনের সমগ্রতা সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা দেবে, তেমনই সমস্ত পেশার গুরুত্ব বুঝতে ও সেই মানুষগুলিকে যথেষ্ট সম্মান করতেও শেখাবে। সামাজিক সাম্যের আদর্শকে রূপায়িত করতে এই পদক্ষেপের পরিণাম সুদূরপ্রসারী হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

এই নীতির আরেকটি বহু চর্চিত প্রস্তাব হলো বিভিন্ন ধরনের বিষয়ের মধ্যে ভেদাভেদের প্রাচীর ভেঙে দেওয়া। একদিকে মূল শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রাচীর ভেঙে যাচ্ছে। অপরদিকে কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য এই পৃথক পৃথক ধারাগুলির মধ্যেও বিভাজনের প্রাচীর ভাঙতে চলেছে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর মধ্যে এবং উচ্চশিক্ষার প্রাঙ্গণেও বিদ্যার্থীরা সমস্ত বিকল্পগুলির মধ্যে থেকে তাদের পছন্দমতো

বিষয়সমূহ বেছে নিতে পারবে। অর্থাৎ কেউ পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে সংস্কৃত পড়তে চাইলে পড়তে পারবে, ইতিহাসের সঙ্গে জীববিদ্যা পড়তে চাইলেও তা পারবে। তার সঙ্গে সঙ্গে সংগীত, চারুকলা ও ক্রীড়াকেও পাঠ্যক্রম-বহির্ভূত 'একস্ট্রা' বিষয় হিসেবে না দেখে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত অন্য যে কোনো বিষয়ের সঙ্গে সমান গুরুত্বসহকারে রাখা হয়েছে। বিষয় চয়নের এই বিস্তার ও স্বাধীনতা যেমন পছন্দমতো বিষয় নিয়ে পড়াশোনার করার ও ছাত্রের ভবিষ্যত জীবনপথ গঠন করার স্বাধীনতা প্রদান করবে সেরকমই বিভিন্ন ধরনের প্রতিভাকে প্রোৎসাহিত করে আমাদের সমাজের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করবে। এতদিন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিভা ও সৃজনশীলতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে সকলকে এক ধাঁচে গড়ে তোলার যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হয়তো তারই ফলে এদেশে এত প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও আমরা অত্যাধুনিক গবেষণার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিলাম, উদ্ভাবনশক্তি বিকাশের বদলে গতানুগতিককেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছি, এর পরিণাম হিসেবে প্রযুক্তির উৎপাদক না হয়ে ভোক্তায় পরিণত হয়েছি। এই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বের দরবারে আমাদের প্রযুক্তির উৎপাদক রূপে দাঁড় করানোর একটা প্রয়াস আমরা এই শিক্ষানীতির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।

বৃত্তিমূলক বিষয়ের ক্ষেত্রেই হোক অথবা সাধারণ বিষয়ের পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রেই হোক, এই শিক্ষানীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে আঞ্চলিক ও স্থানীয় জ্ঞানপরম্পরাকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছে। বলা হয়েছে বৃত্তিমূলক বিষয়ের চয়ন সেই অঞ্চলের ঐতিহ্য ও প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী হবে এবং পাঠ্যক্রমের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে স্থানীয় লৌকিক জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অর্থাৎ স্থানীয় কৃষক, মৎস্যজীবী প্রভৃতির যুগ যুগ ধরে চলে আসা বৃত্তিমূলক জ্ঞানকে প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হচ্ছে তার সঙ্গে জনজাতীদের মৌখিক জ্ঞানপরম্পরা বিশেষ করে ভেষজ চিকিৎসার ক্ষেত্রে, পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা

এই শিক্ষানীতি শিক্ষকদের প্রকৃত যোগ্যতানুযায়ী কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করে দেবে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম রবীন্দ্রনাথের ভাবনা অনুসরণ করে শিক্ষকদের মর্যাদাকে গুরুত্ব সহকারে সম্মান দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এই প্রথম হস্তশিল্পী, কৃষক, তন্তুবায়-সহ চিরাচরিত বিভিন্ন পেশার মানুষকে শিক্ষকের মর্যাদা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁরা এখন থেকে প্রস্তাবিত ক্লাস্টার স্কুলে ক্লাস নিতে পারবেন।

—ড. বিপ্লব লোহচৌধুরী
বিভাগীয় প্রধান, সেন্টার ফর জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন

হয়েছে। স্থানীয় ও লৌকিক জ্ঞানের সঙ্গে আজকের বিশ্বের অত্যাধুনিক বিষয়সমূহ যেমন কোডিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ৩-ডি ও ৭-ডি ডিজাইন, ন্যানোপ্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, এতটাই যে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে কোডিং শেখানোর কথা বলা হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বের ভালো নাগরিক হবার জন্য যে সমস্ত বিষয়ে সচেতনতা দরকার যেমন পরিবেশ রক্ষা ও জৈব প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতিও পাঠ্যক্রমে সংযুক্ত করা হয়েছে। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহুবিষয়ভিত্তিক হবে অর্থাৎ কলা-বিজ্ঞান-বাণিজ্য- কৃষি-মেডিক্যাল- ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি সকল বিষয়ই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হবে। বিএড-এর কোনা পৃথক প্রতিষ্ঠান থাকবে না, বরং বহুবিষয়ভিত্তিক কলেজেই তা পড়ানো হবে।

উচ্চশিক্ষাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য হাইয়ার এডুকেশন কমিশন অব ইন্ডিয়া গঠনের প্রস্তাব করা করা হয়েছে। এই সংস্থানের অধীনে অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থান পাঠ্যক্রম, বিশ্ববিদ্যালয় ও সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি দেখাশোনা করবে। গবেষণাকে প্রোৎসাহিত করতে ও তার গুণমান উন্নত করতে একটি ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন গঠন করা হবে। এই প্রস্তাবগুলিকে কার্যকরী করতে হলে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। বেসরকারি দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষার অগ্রগতির জন্য ব্যয় করতে প্রোৎসাহিত করা হবে, যদিও শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ রোধ করার ব্যবস্থাও বলা হয়েছে। আবার সরকারি ব্যয় প্রচুর বৃদ্ধির সুপারিশও রয়েছে। মোট দেশীয় উৎপাদনের ৬ শতাংশ (যা বর্তমানে ৪.৪৩ শতাংশ) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির শিক্ষাখাতে মিলিত ব্যয় হওয়া উচিত বলে স্পষ্ট পরামর্শ করা হয়েছে।

এই শিক্ষানীতি যদি সঠিকভাবে রূপায়িত হয় তবে ভারতবাসী হিসেবে আমরা নিজস্ব জাতীয় পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেই একবিংশ শতাব্দীর উন্নত দেশের তালিকায় প্রবেশ করতে পারব। তারই দিকনির্দেশ এই নীতি করেছে। তবে এর জন্য সমস্ত রাজনৈতিক ভেদাভেদের উর্ধ্বে উঠে সব রাজ্য সরকার, শিক্ষা প্রশাসকগণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাবিদদের এগিয়ে এসে নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে এর বাস্তবায়ন করতে হবে। তা যদি আমাদের দ্বারা সম্ভবপর হয় তাহলে ভারত আবার সারা বিশ্বে শিক্ষার এক উজ্জ্বল কেন্দ্র হয়ে উঠবে এবং 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ' এই স্বপ্নকে আমরা অদূর ভবিষ্যতেই সাকার রূপ প্রদান করতে সক্ষম হব।

(লেখক সহযোগী অধ্যাপক, কাটোয়া মহাবিদ্যালয়)

কেবল ধ্রুপদী শিক্ষাক্রমই শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটায়

প্রবীর ভট্টাচার্য্য

ছোটোবেলার কিছু বই এবং বন্ধুদের কাছ থেকে কিছু জোগাড় কয়েক বছর আগে একটি লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলাম। লক্ষ্য ছিল পাঠক্রমে যুক্ত না থাকা বিষয়গুলি, যা সমাজ ও রাষ্ট্রকে জানার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাতে ছোটোদের আগ্রহী করে তোলা এবং মানসিক বিকাশের জন্য সাংস্কৃতিক রুচির পরিবর্তন করা। এজন্য নাচ, গান, কবিতা বলা, ঘুরতে নিয়ে যাওয়া— আরও অনেক কিছুর ব্যবস্থা হলো। জোর দেওয়া হলো ধ্রুপদী শিক্ষা ব্যবস্থায়। কারণ নিজের শিকড়কে না জানলে কোনো শিক্ষাই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক এই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গিয়ে মূল প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো অভিভাবকরা। শিশুর কাছে অভিভাবকের চাহিদা হলো প্রাপ্ত নম্বর। নাচ, গান নাটক, ছবি আঁকা, খেলাধুলা বা দেশ-বিদেশের নানান ধরনের গল্পের বই পড়া আজকের দিনের অভিভাবক ও শিক্ষকদেরও একাংশ মনে করেন এতে সময় শুধু নষ্ট। আবার সংগীত ও নৃত্যের অনুশীলনে চটকদারি মাচার নৃত্য ধ্রুপদী তালিমে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। কবিতার চর্চায় প্রবল প্রতিবন্ধক আশির দশক থেকে আধুনিক কবিতার নামে ভারত ও ভারতীয় সংস্কৃতি-বিরোধী অসংখ্য রচনা। রবীন্দ্রনাথ ও সমতুল সাহিত্যকে সম্বল করে এই চর্চা চালাতে কালঘাম ছুটে গিয়েছে। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য, বঙ্গ ও বাঙ্গালির গৌরব, স্বাধীনতা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস নিয়ে চর্চা করতেও কম বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়নি। তবে, ছোটোরা কিন্তু এই ব্যবস্থায় এতটাই আনন্দ পেয়েছে যে, বাড়ির সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ করে এই আয়োজন তারা টিকিয়ে রেখেছে। পড়ার বইয়ের মধ্যে গল্পের বই রেখে গোগ্রাসে গিলেছে দেশ-বিদেশের নানা অজানা ঘটনা আর রহস্য। মায়ের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই জেনে ফেলেছে মহারাজা শশাঙ্ক থেকে প্রতাপাদিত্য, ফেলুদা থেকে বঙ্কিমে অবাধ বিচরণ করেছে। হইহই করে নিজের এলাকা থেকে পাশের এলাকা চেনার আনন্দ উপভোগ করেছে। শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশে অতীব সহায়ক ও অত্যন্ত স্বাভাবিক এই আনন্দগুলো পেতে এত লুকোছাপার কারণ একটাই—এগুলো সিলেবাসে নেই।

সিলেবাসে না থাকা ও আরও নম্বরের প্রতিযোগিতায় বিকেলের খেলা ফেলে পিঠে ভারী বইয়ের বোঝা নিয়ে, এ মাস্টার থেকে সে মাস্টারের বাড়ি ঘুরে বেড়াতে বেড়াতেই আগামী প্রজন্মের সময় চলে যায়। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার দৌড়ে ব্যর্থ ছেলে-মেয়েরা অন্ধকারে ভবিষ্যৎ হাতড়ে বেড়ায়। উচ্চশিক্ষায় বিষয় নির্বাচনে পছন্দের চেয়েও বেশি মূল্যবান হয়ে দাঁড়ায় প্রয়োজন। আনন্দহীন বিষাদ নিয়ে বেড়ে ওঠা এই প্রজন্মই তো কথায় কাথায় অবাধ্য হয়ে ওঠে, ন্যায়নীতিবোধ না শেখায় অন্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে অবলীলায়।

সত্তর বছর ধরে চলা ভ্রান্ত শিক্ষা ব্যবস্থার কলুষময় পরিবেশকে হেমন্তের হাওয়ায় শুদ্ধ করে দিল নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি। মাতৃভাষা, সাহিত্য, সংগীত, দর্শন, শিল্প, নৃত্য, থিয়েটার, গণিত, পরিসংখ্যান, সমাজবিজ্ঞান , অর্থনীতি, ক্রীড়া ইত্যাদি বিষয়কে উচ্চশিক্ষার পাটক্রমে যুক্ত করা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এখন থেকে গুরুত্ব পাবে ভারতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ভাষা ইত্যাদি। সমাজ সেবা, পরিবেশ বিদ্যা, নীতিশিক্ষা ইত্যাদি প্রজেক্টের মাধ্যমে বিদ্যালয় স্তর থেকেই শিক্ষার্থীদের চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করবে। এতে নম্বরও যোগ হবে। ফলে মধ্য চিন্তার অভিভাবকদের শ্যেনদৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য তা হলো বিষয় নির্বাচন। এতদিন বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ইতিহাসের প্রতি ভালোবাসা থাকলেও নিয়মের বেড়াজালে তা পাঠে বঞ্চিত হয়েছে। এবার সেই অসাম্য ঘুচে গেল।

নতুন এই শিক্ষানীতিতে দেশর ধ্রুপদী বা ক্লাসিকাল ভাষা সংক্রান্ত কয়েকটি সুপারিশ করা হয়েছে। এবং এর মাধ্যমে সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালির মতো সুপ্রাচীন ধ্রুপদী ভাষা

নতুন শিক্ষানীতিতে প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে যুক্তিসঙ্গত ভাবে বিভাজন করা হয়েছে। এর ফলে যথাযথ ভাবে শিক্ষাদান সম্ভব হবে।

—ড. চিত্তরঞ্জন মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার পূর্বতন অধ্যাপক

ছাড়াও বেশ কয়েকটি আধুনিক ভাষাকে পঠনপাঠনের আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে। এই তালিকায় তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালায়ালাম ও ওড়িয়া ভাষার ক্লাসিকাল রূপ ও ক্লাসিক সাহিত্যকে বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রমে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখার কথা বলা হয়েছে। পাঁচ-পাঁচটি ভারতীয় ভাষা ছাড়াও একটি বিদেশি ভাষা ফারসিকেও এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথচ এই তালিকায় বাংলাভাষার নাম নেই। বিভিন্ন মহলে এনিয়ে বিক্ষিপ্ত সমালোচনাও হচ্ছে। কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী থেকে বাম, অতিবাম অনেকেই এ নিয়ে সরব।

এখানে জেনে রাখা ভালো যে, ক্লাসিকাল বা ধ্রুপদী তালিকায় বাংলাভাষা না থাকার বিষয়ে এই নীতির প্রস্তাবক কস্তুরীরঙ্গন কমিশনের কিছুই করার ছিল না। আধুনিক যে ভাষাগুলির ধ্রুপদী মর্যাদা লাভ হয়েছে তার মধ্যে তামিল সর্বপ্রথম ২০০৪ সালে এই স্বীকৃতি লাভ করে। এর পর ক্রমান্বয়ে সংস্কৃত(২০০৫), কন্নড়, তেলুগু (২০০৮), মালায়ালাম (২০১৩) এবং ওড়িয়া (২০১৫) এই স্বীকৃতি লাভ করে।

এখন প্রশ্ন, মনমোহন সিংহ সরকারের সংসদে যখন ভাষার ধ্রুপদীকরণে দক্ষিণের সাংসদরা সোচ্চার, তখন বাম শাসিত পশ্চিমবঙ্গের সাংসদ ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা কী ছিল? ২০০৪ সালে প্রথম ইউপিএ সরকারে মমতা ব্যানার্জি তখন মন্ত্রী, সংখ্যার বিচারে বামেরাও মন্দ ছিল না। লোকসভায় দুটি বামদলের মিলিত সদস্য ২৯। দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারে লোকসভায় তৃণমূল ১৯ জন সদস্য নিয়ে যথেষ্ট শক্তিশালী। বামেদের সদস্য সংখ্যা ১৬। অথচ এই আলোচনাচক্রে বাম বা তৃণমূল সাংসদের কোনো ভূমিকা লিপিবদ্ধ নেই। সুনীল গাঙ্গুলির নেতৃত্বে স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীদের গুন্ডাবাহিনী তখন কলকাতার রাস্তায়, দোকানে দোকানে হিন্দি সাইনবোর্ড খুলতে ব্যস্ত। আরব সাম্রাজ্যবাদীদের অঙ্গুলিহেলনে দুই বঙ্গের সংযুক্তি ঘটিয়ে কী করে 'বৃহৎ বাঙ্গলা' গড়া যায়, সেই ষড়যন্ত্রে ধর্মতলায় তখন গড়ে উঠেছে ভাষাশহিদ স্মারক সমিতি।

অতএব, ভারতবর্ষে ধ্রুপদী ভাষা সংস্কৃতি চর্চায় সময় নষ্ট বলেই মনে করেছে পশ্চিমবঙ্গের এই দুর্বুদ্ধিজীবীর দল। কারণ, এই ধ্রুপদী ভাষার দাবি মানেই তো প্রাচীন বঙ্গ সংস্কৃতিকে স্বীকার করা, যা আদপে সনাতন ভারতবর্ষ বা হিন্দু সংস্কৃতি। আরব সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে তা মেনে নেওয়া অসম্ভব। এই কারণে চরম নিরুৎসাহ ও ঔদাসীন্য দেখিয়েছে বামপন্থী সরকার ও তাদের লালিত বুদ্ধিজীবীর দল।

শুধু ভাষা নয়, সুপ্রাচীন বঙ্গ সংস্কৃতি যা ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, সেই গৌড়বঙ্গের সংস্কৃতি 'গৌড়ীয় নৃত্য' সর্বজনমান্য নৃত্যগুরু ও গুণীজনের বিশেষ প্রশংসা লাভ করলেও রাজ্য সরকারের তরফে তাকে মেনে নিতে প্রবল অনাগ্রহ আমরা লক্ষ্য করেছি। কারণ একই — হিন্দু সংস্কৃতির প্রচার চলবে না।

বঙ্গপ্রদেশ শুধুমাত্র ভাষার কারণের নয়, বরং দক্ষিণ ভারতের মতো এই ভৌগোলিক অঞ্চলও সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। কমপক্ষ আড়াই হাজার বছরের ধারাবাহিক নিদর্শন রয়েছে তার। মহামুনি ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন, "অঙ্গা বঙ্গা উৎকলিঙ্গা বৎসাশ্চৈবৌড্রমাগধা।" নাট্যশাস্ত্রে নৃত্য সংস্কৃতির চারটি প্রকারের উল্লেখ আছে— আবন্তী, দাক্ষিণাত্য, পাঞ্চালী ও ঔড্রমাগধী। এই ঔড্রমাগধী নৃত্যধারাই গৌড়বঙ্গে প্রচলিত ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়েও বঙ্গদেশে এর প্রভাব ছিল অপরিসীম। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু স্বয়ং এর প্রচারক ছিলেন। তিনি নিজেও ছিলেন একজন নৃত্যশিল্পী। 'রুক্মিণীহরণ' পালায় তিনি রুক্মিণীর ভূমিকায় নৃত্যাভিনয় করেছেন। হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল'-এ চৈতন্যদেবের নৃত্যের কথা পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দম্ কাব্যগ্রন্থে এই নৃত্যধারার বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রাচীন বঙ্গের এই শাস্ত্রীয় বা ধ্রুপদী নৃত্যধারা বয়ে চলেছে সাহিত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রকলায়, শাস্ত্রে। আশির দশকে অধ্যাপিকা মহুয়া মুখোপাধ্যায়ের সুবৃহৎ গবেষণার মধ্য দিয়ে এই ধারাকে পুনর্জাগরিত করা হয়। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র, মতঙ্গমুনির বৃহদ্দেশী, শারঙ্গদেবের সংগীত রত্নাকর, মহেশ্বর মহাপাত্রের অভিনয় চন্দ্রিকা, পণ্ডিত শুভঙ্করের সংগীত দামোদর, শ্রীহস্তমুক্তাবলী, কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দম্, রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বল নীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ইত্যাদি বহু শাস্ত্রগ্রন্থে অসামান্য নৃত্যধারার উল্লেখ রয়েছে। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল বা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা আশ্রিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কীর্তনাঙ্গে সমৃদ্ধ গৌড়বঙ্গের এই ধ্রুপদী নৃত্য।

হাজার হাজার নৃত্যশিল্পী এই নৃত্যধারার চর্চা করে চলেছেন, রচনা হয়েছে অসংখ্য প্রবন্ধ, একাধিক গবেষণা, মৌলিক গ্রন্থ, তথ্যচিত্র। দেশে বিদেশে প্রভূত প্রশংসা কুড়োলেও আজও মেলেনি ধ্রুপদী হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। ১৯৫৩ সালে সংগীত অ্যাকাডমি গড়ে ওঠে। একে একে স্বীকৃতি পায় দক্ষিণের ভরতনাট্যম্, কথাকলি, কুচিপুরি, মোহিনীআট্যম্। ভরতমুনির নাত্যশাস্ত্রনুযায়ী পাঞ্চালী ও আবন্তীর পুনর্জাগরণ না ঘটলেও ঔড্রমাগধীরূপে মণিপুরি, ওড়িশি, সত্রীয় স্বীয় স্বীয় প্রদেশের মানুষের উৎসাহ ও দরবারে স্বীকৃতি পেয়েছে। গৌড়ীয়নৃত্যের স্বীকৃতির দাবি শুধুমাত্র ধ্রুপদী ধারার অনুশীলনের জন্য নয়, বরং বামৈস্লামিক শক্তির মিলিত প্রয়াসে রুদ্ধ হয়ে যাওয়া বঙ্গ সংস্কৃতিকে পুনর্জাগরিত করতে পারে এই ধ্রুপদী ধারা। বৃহদ্ বঙ্গের ষড়যন্ত্রে কুঠারাঘাত করবে বঙ্গ সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের এই মহামন্ত্র। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রস্তাবকরা দেশের সনাতনী মাঙ্গলিক ধ্রুপদী এই শিক্ষা ব্যবস্থাই তো শিশুদের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন।

ভাষার অধিকারের দাবিতে যে বাঙ্গালির আন্দোলন মানভূম থেকে দাড়িভিট পর্যন্ত আজও উজ্জ্বল; সেই বাঙ্গালির পরিচয় চিহ্নিত করেই ভাষা সংস্কৃতির এই দাবির পক্ষে জোরদার আওয়াজ তুতে হবে। মেধা ও প্রযুক্তির মেলবন্ধন ঘটিয়ে এই নয়া শিক্ষানীতি শিশুদের এই ইঁদুর দৌড়ের ঘৃণ্য প্রতিযোগিতা থেকে মুক্তি দেবে। পাশাপাশি ধ্রুপদী সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে মানসিক বিকাশ ঘটিয়ে দেশ ও সমাজের কাছে উপযুক্ত উন্নত নাগরিক করে গড়ে তুলবে এই স্বপ্নই তো দেখিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ।

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি

এক আশার আলো

স্বাধীন ভারতবর্ষে এই প্রথম ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের কথা মাথায় রেখে একটি শিক্ষানীতি গৃহীত হয়েছে। এর রূপায়ণের জন্য অবশ্যই প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তারও সংস্থানের জন্য দিকনির্দেশ করে বলা হয়েছে যে দেশের জিডিপি-র ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করতে হবে যা এখন অর্ধেকের থেকেও কম।

ড. নারায়ণ চক্রবর্তী

মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষানীতি যা স্বাধীন ভারতেও অনেক দিন চলেছিল তার প্রয়োজনীয়তা অনেক আগে ফুরোলেও কিন্তু কোঠারি কমিশনের পর শিক্ষানীতিতে কসমেটিক পরিবর্তন ছাড়া আর বিশেষ কিছু হয়নি। আমাদের শেষ ঘোষিত শিক্ষানীতি ছিল ১৯৮৬ সালে (National Policy of Education)। তারপর T.S.R. Dubramaniam Committee (May, 2016) এবং তারপর K. Kasturirangan Committee (May, 2019)। এই শেষোক্ত কমিটির রিপোর্ট বিস্তৃতভাবে শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিপুল সংখ্যক মানুষের মতামত নেবার পর গত ২৯ জুলাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলী তা গ্রহণ করেছে। একথা বললে ভুল হবে যে রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে কোনো আলোচনা করা হয়নি। করা হয়েছে, মতামত চাওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন রাজনৈতিক অবমূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের দেওয়া মত গৃহীত না হলেই বলা হয় যে আলোচনা হয়নি। শিক্ষা কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ তালিকায় থাকায় রাজ্যকে বাদ দিয়ে কিছু করা সম্ভব নয়। আবার রাজ্যকেও মনে রাখতে হবে যে তারা স্বতন্ত্রভাবে 'তালিবানি শিক্ষাকে' ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে প্রমোট করার অধিকার রাখে না। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর বামপন্থী তথাকথিত শিক্ষাবিদের চাপ ছিল কসমেটিক পরিবর্তনের পক্ষে, সরকারকে ধন্যবাদ যে আগের সরকারের মতো তারা এই চাপের কাছে নতি স্বীকার করেনি।

এই শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হলো— স্কুলশিক্ষার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের আলাদা আলাদা চাপ লাঘব। একটু ব্যাখ্যা করে বললে বোঝা যাবে। একটি শিশুশিক্ষার জগতে প্রথম তিন বছর প্রাক্ স্কুলশিক্ষায় থাকবে। তারপর দু'বছর গ্রেড ওয়ান ও গ্রেড টু-তে কোনো বিশেষ সিলেবাসের বোঝা থাকবে না। খেলাধুলা, অক্ষর পরিচয়, সংখ্যার পরিচয়, ছড়া ও গানের মাধ্যমে জেনারেল হাইজিন ইত্যাদি। এই সময় থেকেই শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীর inclination লক্ষ্য করবেন এবং শিক্ষক-অভিভাবক মিটিঙে তা বিশদে আলোচনা করবেন। এর পরের তিন বছর গ্রেড থ্রি থেকে গ্রেড ফাইভ পর্যন্ত মাতৃভাষা ও স্থানীয় ভাষার সঙ্গে ইংরেজি ভাষায়ও শিক্ষাদানের সুযোগ থাকবে। এখানেও শিক্ষক-অভিভাবকের ছাত্রসম্বন্ধে, তার চিন্তা ও ধারণার মূল্যায়নে জোর দেওয়া হবে। এ ধরনের শিক্ষা

আমেরিকাতে হয়। ইউরোপের কিছু জায়গাতেও হয়। এতে ছাত্র-ছাত্রীর মানসিক গঠন অনেক পোক্ত হয়। সর্বোপরি মুখস্ত করার চটজলদি প্রক্রিয়া ও নোট গলাধঃকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক বিকাশের এখান থেকেই শুরু হবে। এখান থেকেই মেকলের কেরানি তৈরির শিক্ষাব্যবস্থার গঙ্গাজলি যাত্রা শুরু। এর পরের তিন বছর গ্রেড সিক্স, সেভেন ও এইট। এখানে বিষয় সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং আগের মতোই আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষার সুযোগ থাকবে। এই পর্যন্ত সর্বশিক্ষা। এখানেই মানুষ গঠনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া শেষ। যে জন্য যথার্থভাবে মন্ত্রকের নাম পালটে আমাদের ছাত্রাবস্থার নাম— 'শিক্ষা মন্ত্রক' ফিরে এসেছে। কমিউনিস্ট আদর্শে মানুষ একটি 'রিসোর্স' যা একটি 'কমোডিটি' মাত্র। সেজন্য আগের শিক্ষাব্যবস্থায় স্টুডেন্টদের বাধ্য করা হতো সেট প্যাটার্নের সিলেবাসে সেট বিষয় সমষ্টি পড়তে। Propaganda oriented cramming in brain— সেখান থেকে অনেক মুক্তমনে মানসিক বিকাশের সুযোগ স্টুডেন্টদের দেওয়া হলো। এই জায়গাতে শিক্ষকদের যথার্থ নিবিড় ট্রেনিঙের প্রয়োজন। কারণ শিক্ষাদানের ঘাত-প্রতিঘাত পরিবর্তিত হলো। আগে তাদের কাজ ছিল 'মানব সম্পদ উন্নয়ন' সাধন, আর এখন হলো ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক ও মস্তিষ্কের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করা। কাজটা শক্ত হলেও এর মাধ্যমেই পাওয়া যায় শিক্ষকের কাজের সার্থকতা।

এরপর নবম থেকে দ্বাদশ চারটি গ্রেড চার বছরের। এখানে একজন ছাত্রের বিকাশের জন্য চব্বিশটি বিষয়ের অপশন থাকছে। কোনো গ্রুপ নেই। কেউ বায়োলজির সঙ্গে ইতিহাস বা অঙ্কের সঙ্গে সংস্কৃত নিতে পারে। পরাধীন মানসিকতা থেকে স্বাধীন মানসিকতায় উত্তরণ। যে বিষয় যার ভালো লাগে সে সেই বিষয় পড়বে। এখানে বিষয়ের মূল জায়গায় বিভিন্ন হাতে-কাজ শিক্ষাকেও রাখা হয়েছে। ইউরোপের একাধিক দেশে এতে উচ্চশিক্ষারও সুযোগ আছে। আমাদের দেশেও তা দেওয়া হলো। ফলে কৃষক, কুমোর, কামার, মালী, শিল্পী প্রভৃতিরা মূল শিক্ষিত সমাজের অঙ্গ হবেন। কোনো কাজ বা শিক্ষাই ছোটো নয়।

আমার মনে পড়ে গেল বেশ কয়েক বছর আগে নিউজার্সি শহরে একটা আমন্ত্রণী বক্তৃতা দিতে গিয়ে একজন এমডি ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি সোশ্যাল সায়েন্সে গ্র্যাজুয়েশানের পর ডাক্তারি পড়েছিলেন। এটা ওদেশে স্বাভাবিক ব্যাপার। ডি ব্রগলির নাম ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি পড়া সবাই জানেন। তিনি ফিজিক্সে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। ডি ব্রগলি বিজ্ঞান পড়ার আগে ইতিহাসে গ্র্যাজুয়েশান করেছিলেন। এই চার বছরে বিষয়বৃদ্ধির জন্য স্টুডেন্টদের উপর যাতে চাপ না বাড়ে, তার জন্য এই চার বছরের পরীক্ষা আটটি সেমিস্টারে ভেঙে দেওয়া হলো। এর একটি বড়ো সুবিধা হচ্ছে স্কুল ড্রপ আউট কমানোর চেষ্টা। ৫+৩+৩+৪ স্কুলশিক্ষার প্রতিটি স্তরের শেষে সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে। এর কোনো পর্যায়ে অর্থনৈতিক বা অন্য কারণে ড্রপ আউট হলে পরে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সে আবার যে লেভেল অব্দি পড়েছে তার পরের লেভেল থেকে পড়তে পারবে। এই ব্যবস্থা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও করা হয়েছে।

এরপর আসি উচ্চশিক্ষায়। স্নাতক স্তর ন্যূনতম তিন বছর। সেখানেও বিষয় বাছার সুযোগ স্টুডেন্টদের থাকবে। কোনো বিশেষ গ্রুপ বা বিষয়ের clusture থাকবে না। তিন বছর পড়ার পর স্নাতক ডিগ্রি পাওয়া যাবে। কিন্তু স্নাতকোত্তর পড়তে গেলে স্নাতক স্তরে আরও এক বছর অর্থাৎ মোট চার বছর পড়তে হবে। তারপর এক বা দু'বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স। এই প্রকারভেদ জেনারেল ও টেকনিক্যাল পড়াশোনার ক্ষেত্রে। তারপর স্টুডেন্টরা সরাসরি পিএইচডি করতে পারবে। এম.ফিল. ডিগ্রি আর রইল না। এর অনেকগুলি ভালো দিক আছে। প্রথমে বলি, স্টুডেন্ট কোনো বছরের শেষে পড়া ছেড়ে গেলে সেই বছর অবদি সার্টিফিকেট পাবে। পরে যখন খুশি আবার ফিরে এসে সেখান থেকেই শুরু করতে পারবে। ফলে, কোনো বছর নষ্ট হবে না। এম.ফিল. বন্ধ করা ও কোর্স পিএইচডি করার ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার খর্ব না হলেও শিক্ষকদের ব্যক্তিগত পছন্দের জায়গা সীমিত হলো। এটা একটা ভালো দিক।

যদিও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রক সংখ্যা এখন একাধিক, যেমন AICTE, UGC ইত্যাদি, এখন থেকে একটিই নিয়ন্ত্রক সংস্থা থাকবে। ফলে, দুর্নীতি ও বিতর্ক কমবে। কাজের সুবিধা হবে। দেশের উচ্চশিক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলিতে কেন্দ্রীয়স্তরে গঠিত একটি নিয়ামক সংস্থার মাধ্যমে ছাত্রভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। র‍্যাঙ্ক অনুযায়ী অপশন দিয়ে ছাত্ররা তাদের পছন্দের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে। আমি অনেকদিন ধরে বিভিন্ন ফোরামে এই কথা বলে আসছি। আজ জাতীয় শিক্ষানীতিতে এর অন্তর্ভুক্তি আমাকে খুশি করেছে।

কলেজ ইউনিভার্সিটির মূল্যায়ন পদ্ধতিরও পরিবর্তন হয়েছে। মূল্যায়নে A+ গ্রেড সবচেয়ে বেশি অটোনমি পাবে। A গ্রেড তারপর। B গ্রেডের ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য যা প্রয়োজন তার নির্দিষ্ট উপদেশ থাকবে। মোটের উপর বলতে হয়, স্বাধীন ভারতবর্ষে এই প্রথম ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের কথা মাথায় রেখে একটি শিক্ষানীতি গৃহীত হয়েছে। এর রূপায়ণের জন্য অবশ্যই প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তারও সংস্থানের জন্য দিকনির্দেশ করে বলা হয়েছে যে দেশের জিডিপি-র ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করতে হবে যা এখন অর্ধেকের থেকেও কম। আগের শিক্ষাব্যবস্থায় স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ ছিল না বা থাকলেও target oriented সংকুচিত চিন্তাধারা মাত্র। এই শিক্ষায় শিশুকাল থেকেই application oriented শিক্ষার ব্যবস্থা থাকায় তা স্বাধীন চিন্তার উপযোগী মস্তিষ্ক গঠনের সহায়ক হবে। সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার উন্নতিতে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি আলোর দিশারি হয়ে দেখা দেবে।

(লেখক মৌলানা আজাদ কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও পশ্চিমবঙ্গের বায়োটেক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের প্রাক্তন পরামর্শদাতা ও ডিরেক্টর)

জাতীয় শিক্ষানীতি : বামপন্থীদের কুম্ভীরাশ্রু

অনুপম বেরা

অনেকদিনের প্রতীক্ষিত জাতীয় শিক্ষানীতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় পাশ হলো। বুধবার ২৯ আগস্ট ২০২০, কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাওড়েকর এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক ঘোষণা করেছেন নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার (ইসরো) প্রাক্তন প্রধান কে কস্তুরীরঙ্গনের নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞদের একটি প্যানেল এই খসড়া তৈরি করে। বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা উভয়ের জন্য প্রস্তাবিত এই নতুন শিক্ষানীতির খসড়া গত বছর ২০১৯-এর জুন মাসে প্রকাশিত হয়েছে। খসড়া প্রকাশিত হওয়ার পর নানা মহল থেকে মতামত চাওয়া হয়। সেই মতামত দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ২০১৯ সালের ৩১ জুলাই। ১৯৪৬ সালে প্রথম জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া তৈরি করেছিলেন তৎকালীন ইউজিসি চেয়ারপারসন ডি এস কোঠারীর নেতৃত্বে ১৭ সদস্যের একটি শিক্ষা কমিশন। এই কমিশনের পরামর্শের ভিত্তিতে ১৯৬৮ সালে দেশে প্রথম জাতীয় শিক্ষানীতি পাশ হয়েছিল। দ্বিতীয় জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হয়েছিল ১৯৮৬ সালে, যা ১৯৯২ সালে একবার সংশোধিত হয়। উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রকের সচিব অমিত খারে জানিয়েছেন, ১৯৮৬ সালের পর দেশে ৩৪ বছর বাদে আবার নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হচ্ছে।

নতুন শিক্ষানীতি বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলের মানুষের কাছে আনন্দের সঙ্গে গৃহীত ও প্রসংশিত হয়েছে। সরকারের সাহসী পদক্ষেপ, মূলত ছাত্রের বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা এবং কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগের অবলুপ্তির সঙ্গে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু অধ্যয়নের বিরতি ও নিজের মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় শেখার বৃহত্তর সুযোগের দ্বারা একটি শিশুর জীবনকে আরও সহজ করে তোলার জন্য এটি প্রশংসিত হয়েছে। এত প্রশংসা সত্ত্বেও আমরা গুটিকয়েক মহল থেকে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখছি। মূলত রাষ্ট্রের চিরকালীন শত্রু বামপন্থী ও তার সহযোগীরা বিরোধিতায় মুখর। এরা কখনও গঠনমূলক মন্তব্য বা সমালোচনা জানে না। তা সে ভারত-পাকিস্তান বা ভারত-চীন বা কাশ্মীর বা রামমন্দির, যে কোনো ব্যাপারেই হোক না কেন, তার সমালোচনা বা আন্দোলন সবই রাষ্ট্রবিরোধী। নতুন শিক্ষানীতির ক্ষেত্রেও তাদের একই মানসিকতা দেখা গেল। যেমন সিপিএম প্রধান সীতারাম ইয়েচুরি টুইট করেছেন : “Bypassing Parliament, ignoring opinion of state governments and rubbishing opinions of all stakeholder, Modi government is unilaterally destroying our education system.” সীতারাম ইয়েচুরি এটি একটি সর্বৈব মিথ্যা কথা বলেছেন। যদি জাতীয় শিক্ষানীতির প্রণয়নের প্রক্রিয়াগুলির দিকে চোখ রাখি তবে দেখতে পাই যে— ২ জানুয়ারি ২০১৫, মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় এই নীতি প্রণয়নের কাজ শুরু করে। ৩৩টি বিষয়কে আলোচনার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছিল। যেখানে অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, নির্বাচিত কর্মকর্তা, প্রশাসক, নাগরিক সমাজের সদস্য এবং নাগরিকদের সঙ্গে আড়াই লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত জুড়ে গ্রাম শিক্ষা কমিটি আলোচনায় অংশ নিয়েছিল। ২৬ নভেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৪২১টি গ্রাম, ৫১৫৫টি ব্লক, ১২০১ নগর স্থানীয় সংস্থা, ৫৭৩টি জেলা এবং ১১টি রাজ্য কীভাবে তারা দেশে শিক্ষার বিষয়টি দেখতে চান সে বিষয়ে তাদের সুপারিশগুলি নথিভুক্ত করেছিল। এছাড়াও ২৯০০০ এরও বেশি নাগরিক www.MyGov.in ওয়েবসাইটে সুপারিশ জমা দিয়েছেন এবং সিবিএসই-র পোর্টালের মাধ্যমে ১৫,০০০ এরও বেশি শিক্ষার্থী তাদের পরামর্শ জমা দিয়েছেন। দীর্ঘ ৫ বছরের চর্চা এবং পর্যায়ক্রমে তার পরিমার্জন দ্বারা বহুকাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় পাশ হয়েছে।

যদি এটা যথেষ্ট গণতান্ত্রিক না হয় তবে কাকে আমরা গণতান্ত্রিক বলবো? প্রকৃতপক্ষে তাঁর ভয় এই যে শিক্ষাক্ষেত্রে বোধহয় বামেদের কট্টর জাতীয়তা বিরোধী প্রচারের ভাটা পড়বে। ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস ও তার সংস্কৃতি পাঠ্যপুস্তক থেকে ব্রাত্য থেকেছে কয়েক দশক ধরে। এখন মনে হয় এই রকম কোনো ইতিহাসই ছিল না। যেন আমাদের পূর্বপুরুষরা এক অশিক্ষিত জাতি ছিলেন। কেবল মুসলমান হানাদার ও ব্রিটিশ উপনিবেশ গড়ে উঠাতেই ভারতবর্ষের শিক্ষার উন্নতি ঘটে। বামপন্থীদল, তাদের সহযোগী এবং বামপন্থী শিক্ষাসংস্কারকদের তাই হয়তো এত গাত্রদাহ।

বাম-ইসলামপন্থীরা দাবি করেন কেন্দ্র জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে সংস্কৃত যা কিনা একটি ‘মৃত ভাষা’, পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছে ও সেই সঙ্গে ‘যোগ’ যা কিনা ‘হিন্দু পৌরাণিক কাহিনিতে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি অনুশীলন মাত্র’ তাকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে। এক কথায় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতির নামে শিক্ষার গৈরিকীকরণ করছে। এই ভয় খুব একটা ভিত্তিহীন নয়। জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়াটি বাম-ইসলামপন্থী নিয়ন্ত্রণের লোহার খাঁচা থেকে প্রাচীন জ্ঞানকে মুক্ত করার অভিপ্রায়টি পুরোপুরি পরিষ্কার করেছে। তা যদি গৈরিকীকরণ হয় তবে তাই হোক। ভারতবর্ষের সঠিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সেখানে প্রাচীন গৌরবময় শিক্ষা ব্যবস্থার স্বাদ থাকতেই হবে। যেটা এতদিন ছিল না। স্বাধীনতার ৭৪ বছর পর পর্যন্ত বামপন্থীরা সর্বত্র ব্রিটিশ উপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু রেখেছে। বামপন্থীদের সুচতুর উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘পথের সঞ্চয়’ প্রবন্ধে বলেছেন, ‘‘যে শিক্ষা স্বজাতির নানা লোকের নানা চেষ্টার দ্বারা নানা ভাবে চালিত হইতেছে তাহাকেই জাতীয় বলিতে পারি। স্বজাতীয়ের শাসনেই হউক আর বিজাতীয়ের শাসনে হউক, যখন কোনো একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা কোনো ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহা জাতীয় বলিতে পারি না— তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।’’

শিক্ষানীতি দলিত সম্প্রদায় বা কোনো গোষ্ঠী বিরোধী হতে পারে কি? শিক্ষানীতি সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও তার মানের সঠিক মূল্যায়ন ঘটাতে পারে। এর অন্যথা অন্য কিছু নয়। কংগ্রেসে নেতা সূর্যেওয়ালা অভিযোগ করছেন যে, প্রস্তাবিত নীতিতে দলিতদের জন্য কিছুই নেই। আবার প্রাক্তন মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শশী থারুর সন্দেহ করছেন নীতি রূপায়ণ আদতেও হবে কিনা! এছাড়া আরও কত ধরনের অযৌক্তিক যুক্তি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বামপন্থীরা প্রচার করছে। যেমন দলিত উৎপীড়ন বাড়বে, অর্থনৈতিক ব্যবধানকে আরও প্রশস্ত করবে, ধনী বাড়ির ছেলে-মেয়েরাই কম্পিউটার ও তার প্রযুক্তিবিদ্যাতে পারদর্শী হয়ে উঠবে। প্রযুক্তি কি ভারতে কেবল ধনী ব্যক্তিরাই ব্যবহার করেন? বোধহয় আজ এটা একটা ভ্রান্ত ধারণায় পরিণত হয়েছে। যদি ডিসেম্বর ২০১৯-এর ট্রাইয়ের তথ্যের দিকে নজর দিই তবে দেখবো ভারতবর্ষে শতকরা ৫৪.২৯ জন মানুষ ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহার করেন এবং তার মধ্যে শতকরা ৯৬.৮ জন মানুষ মোবাইলে ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহার করেন। আবার মোম্যাজিক টেকনোলজিসের ২০২০ মোবাইল ফোন সমীক্ষার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ৮১ শতাংশ ভারতীয় ৪-জি ফোন ব্যবহার করেন। শুধু তাই নয়, বিশ্বের মধ্যে ভারত ৪-জি মোবাইল ডেটার দাম সর্বনিম্ন। ২০২১ সালের মধ্যে ৬০০ মিলিয়নেরও বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়তে চলেছে। এর একটি ছোট্ট অংশই ধনী।

বামপন্থীদের অকাট্য যুক্তি, দরিদ্র ঘরের শিশুরা বিদ্যালয়ে ইংরেজি শেখা থেকে বঞ্চিত হবে আর ধনী বাড়ির শিশুরা বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সব কিছুই শিখবে। ১৯৮০-র দশকে জ্যোতি বসুর বামফ্রন্ট সরকার বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষাকে সমর্থন ও পরিচালনা করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তার জন্য ইংরেজিকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত স্থগিত করেছিল। তার ফল কী ঘটেছিল তা আমরা জানি। তদুপরি, কেন্দ্র সরকার ইংরেজিকে ছাড়িয়ে বা একদম স্থগিত রাখার প্রস্তাব দিচ্ছে না, বরং পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সাহিত্য ব্যতীত অন্য বিষয়গুলো মাতৃভাষায় পড়ানোর প্রস্তাব। আবার বাম প্রচারকরা খুব সহজেই ভুলে যান বা ভুলিয়ে রাখতে চান যে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজি গ্রামীণ বা দারিদ্র্যসীমার নীচের শিশুদের জন্য বেদনাদায়ক এবং তার কারণে অনেক শিশুই অতি অল্প বয়সে বিদ্যালয় যাওয়া বন্ধ করে দেয়। মাতৃভাষাই শিক্ষার জন্য উপযুক্ত এবং ব্রিটিশ আমলের শিক্ষা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘‘আমরা নিজের ভাষার রসনা দিয়া খাই না, আমাদের কলে করিয়া খাওয়ানো হয়, তাতে আমাদের পেট ভর্তি করে, দেহপূর্তি করে না।’’ অর্থাৎ অন্য ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করার চেষ্টা করলে তা হৃদয়ঙ্গম করা মুশকিল। তাঁর ভাষায়, ‘‘বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয়, ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না।’’ বামৈস্লামিকদের বিষাক্ত মাকড়সার জালগুলি আজ শিক্ষাঙ্গনে ভীষণই অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি। তাই তাদের এত অস্থিরতা এবং হতাশার বহিঃপ্রকাশ। জাতীয় পাঠক্রমের আসন্ন পরিবর্তনগুলি বামপন্থীদের কাছে তাই এত অসূয়ার কারণ। ক্ষয়িষ্ণু বামপন্থীদের এত চিৎকার ঠিক যেন প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে দপ করে জ্বলে ওঠার পরিস্থিতিকে মনে করিয়ে দেয়।

শিক্ষা নিজের ভাষায় না হলে কী হতে পারে, তার একটি দৃষ্টান্তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তখন ইউরোপের অন্ধকার যুগ, তা সত্ত্বেও আয়ারল্যান্ডে মিটমিট করে হলেও কিছুটা আলো জ্বলছিল। তাঁর মতে তার অন্যতম কারণ মাতৃভাষায় শিক্ষা। সেখানে শিক্ষার্থীরা ল্যাটিন, গ্রিক ও হিব্রু শিখত বটে, কিন্তু সব শেখানোর ভাষা ছিল আইরিশ। বিপত্তি ঘটল তখনই, যখন আইরিশের বদলে ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন করা হলো। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘‘ইহার ফল যেমন হওয়া উচিত, তাহাই হইল। মানসিক জড়তা সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া গেল। আইরিশভাষী ছেলেরা বুদ্ধি এবং জিজ্ঞাসা লইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল, আর বাহির হইল পঙ্গু মন এবং জ্ঞানের প্রতি বিতৃষ্ণা লইয়া। ইহার কারণ এ শিক্ষাপ্রণালী কলের প্রণালী, ইহাতে মন খাটে না, ছেলেরা তোতাপাখি বনিয়া যায়।’’ রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করলেন একই কারণে ভারতবাসীদের অবস্থাও তথৈবচ। ভারতবর্ষে বিদ্যা বিস্তারের প্রধান বাধা হচ্ছে তার বাহন— ইংরেজি।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতিতে কী ছিল তার একটি বর্ণনা আছে। হয়তো অনেকেই জানি যে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় চরক, সুশ্রুত, আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য, ব্রহ্মগুপ্ত, চাণক্য, চক্রপাণি দত্ত, মাধব, পাণিনি, পতঞ্জলি, নাগার্জুন, গৌতম, পিঙ্গলাচার্য, শঙ্করদেব, মৈত্রেয়, গার্গী বিদ্বানদের মতো কত বিদ্বানই না জন্মেছিলেন। যাঁরা গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ধাতুবিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং সার্জারি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্কিটেকচার, শিপ বিল্ডিং এবং নেভিগেশন, যোগ, চারুকলা, দাবা এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে বিশ্ব জ্ঞানভাণ্ডারে চূড়ান্ত অবদান রেখেছিলেন। যার দরুন বিশ্বব্যাপী ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শনের গভীর প্রভাব রয়েছে। বিশ্ব ঐতিহ্যের এই সমৃদ্ধ ভাণ্ডারগুলি কেবল শুধুই উত্তরসূরিদের জন্য লালিত ও সংরক্ষিত নয়, তবে তা গবেষণার দ্বারা আরও উন্নত এবং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে নতুনভাবে ব্যবহার করতে হবে। পৃথিবীর অনেক দেশেই যেমন শুধু জার্মানিতেই ১৪টির বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা পড়ানো হচ্ছে। যা আমাদের অনেকের কাছে বিস্ময় সৃষ্টি করে। বেদ, উপনিষদ নিয়ে কত দেশ আজ গবেষণা করছে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য যা আজ আমাদের কাছেই ব্রাত্য হয়ে আছে। এর সম্পূর্ণ শ্রেয় বামপন্থীদের । আমরা যাই করি না কেন চাকুরিজীবী হয়ে থাকতে হবে যদি না সময়মতো সঠিক শিক্ষাপদ্ধতি চালু না হয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ‘শিক্ষার হেরফের’ শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, ‘‘আমরা যে শিক্ষা আজন্মকাল যাপন করি, সে শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরানিগিরি অথবা কোনো একটি ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র।’’

বামপন্থীরা সর্বক্ষেত্রে শুধুই বিরোধিতাই করতে জানে; বোধহয় ওদের এটা জন্মগত অধিকার, তা না করলে ভারতের মতো এত বড়ো বাজার কী করে চীনের মতো দেশ আয়ত্তে রাখবে। মিথ্যে মায়াকান্না চিরকালই ওদের ধর্ম। দিনে শিক্ষা বা চাষি বা শ্রমিকের জন্য হাহাকারের মায়াজাল আর রাতে বিদেশি পয়সাতে ফুর্তি। আজ পর্যন্ত সৃষ্টিশীল কোনো কর্ম তাদের নেই। আজ আর সে ভারত নেই যে ভাম(বাম) পন্থীদের মায়াকান্নায় পা মিলিয়ে চলবে। এটা সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাসের নতুন ভারত। হে চিরশত্রু! তোমরা যতই কুম্বীরাশ্রু ঝরাও তোমাদের দেশবাসী আর ক্ষমা করবে না।

(লেখক সহকারী অধ্যাপক,
নেতাজী সুভাষ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ)

বাস্তবে প্রয়োগ হোক রাষ্ট্রীয় ভাবনার নতুন শিক্ষানীতি

ধর্মানন্দ দেব

১৯৮৬ থেকে ২০২০। দীর্ঘ ৩৪ বছর পরে আমাদের ভারতবর্ষ পেল নতুন শিক্ষানীতি। শেষবার ১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা হয়েছিল। উল্লেখ্য, ভারতবর্ষে প্রথম জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত হয় ১৯৬৮ সালে। তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। দ্বিতীয় জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত হয় ১৯৮৬ সালে। তখন দেশে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রাজীব গান্ধী। আর সেই শিক্ষানীতিকে সংশোধিত করা হয় ১৯৯২ সালে। ২০০৯ সালে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার শিক্ষার অধিকার আইন প্রণয়ন করে। ভারতের যোড়শ লোকসভা নির্বাচন শেষে ভারতীয় জনতা পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে সরকার গঠন হয়। এই সরকার একটি নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি রচনার জন্য প্রক্রিয়া হাতে নেয়। তার জন্য কেন্দ্র সরকার খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৬ রূপরেখা প্রকাশ করেছে। এই ৪৩ পৃষ্ঠার রূপরেখার নাম দেওয়া হয়েছিল— Some Inputs for Draft National Education Policy 2016। মোদী সরকার নতুন শিক্ষা নীতি রচনার জন্য ৩৩টি থিম বা বিষয়বস্তু কেন্দ্র সরকারের 'মাইগভ' ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে এবং দেশের বিভিন্ন সংগঠন ও মানুষের কাছ থেকে মতামত জানতে চাওয়া হয়। তাই প্রায় ২৯ হাজার পরামর্শ জমা পড়ে। কেন্দ্র সরকার সেই থিম বা বিষয়বস্তু এবং মতামতগুলিকে নিয়ে একটি খসড়া শিক্ষানীতি তৈরি করার জন্য ২০১৫ সালের ৩১ অক্টোবর কেন্দ্র সরকারের প্রাক্তন সচিব টিএস সুব্রহ্মণ্যমকে প্রধান করে ৫ সদস্যের একটি কমিটি তৈরির কথা ঘোষণা করে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। এই কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যসচিব শৈলজা চন্দ্র, গুজরাটের প্রাক্তন যুগ্মসচিব সুধীর মাকড়, দিল্লির প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রসচিব শেওয়ারাম শর্মা এবং

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ (এনসিইআরটি)-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান জেএস রাজপুত। ২০১৬ সালের ২৭ ওই কমিটি তাদের রিপোর্ট ও ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে কেন্দ্র সরকারের কাছে এক রিপোর্ট জমা দেয়। রিপোর্টটি মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হয়। সম্প্রতি নতুন চূড়ান্ত জাতীয় শিক্ষানীতিতে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে অনুমোদন প্রদান করে। এই নতুন চূড়ান্ত জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রথমেই চোখ পড়বে সমগ্র স্কুল শিক্ষার বিষয়ে নীতি প্রণয়নে স্বকীয়তা। 'সবার জন্য শিক্ষা' স্লোগানটিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার সদর্থক চেষ্টা আছে এই নতুন চূড়ান্ত জাতীয় শিক্ষানীতিতে। শিক্ষানীতি হলো একটি 'নীতি', কোনো পৃথক 'আইন' নয়। তাই ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার (আরটিই) আইনকে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে এখন। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার এই শিক্ষানীতির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আইন তৈরি ও সংশোধন করতে পারবে এবং বাজেটের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থও বরাদ্দ করতে পারবে। এই শিক্ষানীতির বাস্তব রূপায়ণ নির্ভর করবে দেশের রাজ্য সরকারগুলির উপর।

স্কুলশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা, দুই ক্ষেত্রের পাশাপাশি সামগ্রিক শিক্ষা- ব্যবস্থার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যার মধ্যে 'রাইট টু এডুকেশন' বা শিক্ষার অধিকারের বয়সসীমা ৩ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতির ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মাত্রাতিরিক্ত পড়াশোনার চাপ কমবে। কেননা দশম শ্রেণীর বোর্ডের সঙ্গে পরীক্ষা ব্যবস্থা তুলে দিয়ে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত একটি অভিন্ন ৮ সেমিস্টারের ব্যবস্থা আসতে চলেছে। সেকেন্ডারি স্তরে থাকবে না কলা, বিজ্ঞান বা বাণিজ্যের মতো কোনও আলাদা বিভাগ। এক কথায় স্কুল শিক্ষায় ১০+২ পদ্ধতির বদলে ৫+৩+৩+৪ পদ্ধতি। এখন স্কুল শিক্ষায় থাকবে নীচের চারটি বিভাগ :

(১) ফাউন্ডেশন স্টেজ (৩ বছর প্রাক্-প্রাথমিক স্কুলে, ২ বছর প্রাথমিক স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত, সব মিলিয়ে একটি শিশুর ৩ বছর থেকে ৮ বছর বয়স অবধি)।

(২) প্রিপারেটরি স্টেজ (তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত) অর্থাৎ ৮ বছর বয়স অবধি।

(৩) মিডল স্টেজ (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) অর্থাৎ ১১ থেকে ১৪ বছর অবধি।

(৪) সেকেন্ডারি স্টেজ (নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়স অবধি)।

এছাড়াও প্রকৃত জাতীয়তাবাদী শিক্ষানুরাগীদের ভাবনা ও দাবির কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন শিক্ষানীতিতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষা, সংস্কৃতের মতো ভারতীয় ভাষা জনপ্রিয় করার চেষ্টার প্রতিফলন আমরা নতুন শিক্ষানীতিতে পাই। নতুন শিক্ষানীতিতে আরও বলা হয়েছে যে, কোনও ভাষা শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে প্রয়োগ করা হবে না। তাই একটি শিশু যদি তার মাতৃভাষা নিয়ে নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করতে পারে তার থেকে ভালো কিছুই হতে পারে না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিত্বদের মধ্যে এমন অনেকেই পাবেন যারা নিজেদের প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষায় গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছেন— কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং ভারতের সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব আম্বেদকর। দেশের একতা ও অখণ্ডতার জন্যও জরুরি স্থানীয় ভাষায় পড়াশুনা।

পরিবর্তন করা হয়েছে স্নাতক স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রেও। উচ্চশিক্ষায় যারা গবেষণা করবে তাদের চার বছরের কোর্স হবে। স্নাতকোত্তরের পর সরাসরি পিএইচডি। এম,ফিল করতে হবে না। স্নাতক স্তরে প্রতি বছরের পর সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। দ্বিতীয় বছরের পর দেওয়া হবে ডিপ্লোমা। তৃতীয় ও চতুর্থ বছরের পর দেওয়া হবে স্নাতক সার্টিফিকেট। নতুন শিক্ষানীতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংজ্ঞাতেও কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় বলতে বোঝানো হবে যে কোনও বহু শৃঙ্খলাবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেখানে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরে উচ্চ মানের, গবেষণামূলক এবং গোষ্ঠীবদ্ধ শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা সংরক্ষণের জন্য একটি অ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্ক অব ক্রেডিট গঠন করা হবে। সেখানে প্রত্যেক পড়ুয়ার শিক্ষাগত যোগ্যতা ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকবে। সারাদেশে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটিই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা থাকবে। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা উচ্চ শিক্ষা কাউন্সিল (এইচইসিআই) গঠন করবে। আবার তার থাকবে চারটি অংশ। প্রথমটি অবশ্য চিকিৎসা এবং আইনি শিক্ষা এর আওতার বাইরে থাকবে। তার দ্বিতীয় অংশ হলো একটি 'মেটা-অ্যাক্রিডিটিং বডি'। যাকে বলা হয় ন্যাশনাল অ্যাক্রিডেশন এডুকেশন কাউন্সিল, যা উচ্চ শিক্ষার কর্মসূচির জন্য প্রত্যাশিত শিক্ষার ফলাফলের কাঠামো তৈরি করবে। এই রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ তৈরি করে তার ছাতার তলায় ইউজিসি, এআইসিটিই-র মতো সংস্থাকে নিয়ে আসা এবং জাতীয় রিসার্চ ফাউন্ডেশন তৈরি--- এইসব কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভাবনারই প্রতিফলন বলা যায়।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘর অনুপ্রাণিত ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এই নতুন চূড়ান্ত শিক্ষনীতি তৈরি করার জন্য। তার প্রমাণ আমরা পাই নতুন শিক্ষা নীতি প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণে তৈরি হওয়া থেকে। শিক্ষানীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত পড়াশুনা করে একজন ব্যক্তি যাতে ভারতীয় হিসেবে গর্ববোধ করে। নিজের 'মৌলিক দায়িত্ব' সম্পর্কে সচেতন হয়। নতুন শিক্ষানীতির ঘোষিত উদ্দেশ্যও কিন্তু সেই একই কথা বলছে।

নতুন শিক্ষানীতি দেশের যুবসমাজকে নিজের পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ করে দেবে। চাকরি পাওয়ার বদলে চাকরি দিতে সক্ষম হয়ে উঠবে যুবসমাজ। নতুন শিক্ষানীতি অনুসারে ২০২৫ সালের মধ্যে অন্তত ৫০ শতাংশ স্কুল ও উচ্চশিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এই সময়কালে ১০ দিনের ব্যাগবিহীন 'ইন্টার্নের' ব্যবস্থা করতে হবে স্থানীয় কণ্ঠক, কাঠের মিস্ত্রি, মালী, কুমোর, শিল্পী প্রমুখের কাছে। একই ভাবে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তিমূলক বিষয়ে ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ দিতে হবে (ছুটির দিন সমেত)। এই প্রস্তাবগুলি বাস্তবে রূপায়ণ হলে ছাত্র-ছাত্রীরা ভবিষ্যতে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রে নিযুক্ত হতে পারবে। শুধু তাই নয়, এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম বা বিদেশে পড়াশোনার বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নতুন শিক্ষানীতিতে। দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিদেশে ক্যাম্পাস গড়ে তুলবে। নির্দিষ্ট কয়েকটি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ যারা সেরা ১০০-তে রয়েছে তাদের মধ্যে ভারতে ক্যাম্পাস চালুর অনুমতি দেওয়া হবে। ভারতে ক্যাম্পাস গড়তে ইচ্ছুক আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য একটি আইনি পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

আজ থেকে প্রায় এক বছর আগে অর্থাৎ ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত বলেছিলেন, নতুন শিক্ষানীতির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মনির্ভর, স্বাধীন ও স্বাভিমানী করে তোলা হোক। শিক্ষানীতির শিকড় প্রোথিত হোক ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতিতে। আজ নতুন শিক্ষানীতিতে সেইসব কথাই অক্ষরে অক্ষরে লেখা রয়েছে। সঙ্ঘের ভাবনার সিংহভাগই ফুটে উঠেছে নতুন চূড়ান্ত শিক্ষানীতিতে। সঙ্ঘ দাবি জানিয়েছিল 'মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক' নামটি পরিবর্তন করে 'শিক্ষা-সংস্কৃতি মন্ত্রক' রাখার জন্য। উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধী যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী, তখন শিক্ষামন্ত্রকের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখা হয়েছিল মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। বর্তমান এই চূড়ান্ত শিক্ষানীতি অনুসারে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের নাম পরিবর্তন করে শিক্ষামন্ত্রক করা হবে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এ নিয়ে কোনো আপত্তি বা অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেনি। কারণ শিক্ষা তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হবে না। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, এই শিক্ষানীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হলে অর্থের প্রয়োজন হবে। কোঠারি কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছিল জিডিপির ৬ শতাংশ সরকারকে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় করার জন্য। সেটা কোনও দিন মানা হয়নি। তাই শিক্ষার আজ এই হাল হয়েছে। তাই মোদী সরকার ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে এখন শিক্ষা খাতে জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ ব্যয় হবে। তার চেয়ে আনন্দ বা স্বস্তিদায়ক কী হতে পারে।

ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এই দেশের একটি গর্বের বিষয়। উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে পশ্চিমের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদভাণ্ডার আমাদের দেশকে বারে বারে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলেছে বহির্দেশের মানুষের কাছে। বিচিত্র এ দেশের প্রাকৃতিক শোভা, বিচিত্র তার অধিবাসীরাও। জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতির এক মিশ্ররূপ আমাদের দেশ। 'বিবিধের মাঝে'-ও মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, ঐক্যবোধ, সবার জন্য কল্যাণ কাজে, দেশের গণতান্ত্রিক ভিতকে সুদৃঢ় করার কাজে বদ্ধপরিকর আমাদের দেশ। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর সংবিধানে বলা হয়েছিল, সংবিধান চালু হওয়ার দশ বছরের মধ্যে প্রারম্ভিক শিক্ষা সার্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই ১৯৫০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ৭০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও সে স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল। বিশ্ববাসীর ১৭ শতাংশের বাস এই ভারতে। কিন্তু আরও দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিশ্বে চরম দুর্দশাগ্রস্ত যত মানুষ আছে, তার ৩৭ শতাংশের বেশি ভারতে। অন্যদিকে অতি ধনী পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধিতে ভারত বিশ্বের প্রথম স্থানে রয়েছে। এই বৈপরীত্যের মধ্যে দেশকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে পারে দেশের যথার্থ শিক্ষানীতি। শীঘ্রই নয়া শিক্ষানীতি বাস্তবে প্রয়োগ হোক।

লেখাটি শেষ করছি ২০১৬ সালের খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতির প্রস্তাবনার শেষ প্যারাগ্রাফে থাকা শ্রীঅরবিন্দের উক্তি দিয়ে — 'ভারতীয়দের দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে ভারতকে উঠতে হবে ও মহান হতে হবে এবং যে সবকিছু ঘটে গেছে এবং যা অসুবিধা, যা বিপরীত ঘটেছে তা আবশ্যক ভাবে সাহায্য করবে লক্ষ্যের দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে— ভোর শীঘ্রই সম্পূর্ণ হবে এবং সূর্য দিগন্ত ছেড়ে উঠবে। ভারতের ভাগ্যসূর্য উঠবে এবং তার রশ্মি সারা ভারত ভরে তুলবে এবং প্লাবিত করতে সারা ভারত, এশিয়া ও বিশ্বকে।

(লেখক বিশিষ্ট আইনজীবী)

শিক্ষা প্রসঙ্গ

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ

ভারতীয় জীবন দৃষ্টি

ইন্দুমতী কাটদরে

ভারতীয় শিক্ষা পরম্পরা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম এবং শ্রেষ্ঠতম। ভারতের গুরুকুল, আশ্রম, বিদ্যাপীঠ এবং ছোটো ছোটো বিদ্যালয়েই জীবনের সর্বতোমুখী বিকাশ হতো এবং ব্যক্তির তথা রাষ্ট্রের জীবন সুখ, সমৃদ্ধি, সংস্কার এবং জ্ঞানের দ্বারা পরিপূর্ণ হতো। সমগ্র বিশ্বও এতে লাভান্বিত হতো। কিন্তু বণিকরূপে আমাদের দেশে এসে আমাদের শিক্ষার বাণিজিকীকরণ করে তার মূলে কুঠারাঘাত করেছে ইংরেজরা। মেকলে প্রবর্তিত এই ইংরেজ শিক্ষাব্যবস্থার দুষ্প্রভাবে আজও ভারত জর্জরিত। আজ ভারতে ভালো শিক্ষাব্যবস্থার চর্চা সর্বত্রই হয় কিন্তু ভারতীয় শিক্ষার চর্চা তেমন কোথাও হয় না। পাশ্চাত্য আজ নিজের দৃষ্টিকে বৈশ্বিক বা গ্লোবাল বলতে শুরু করেছে। এরই প্রভাবে আজও আমরা পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিকে 'বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি' বলছি। কিন্তু বৈশ্বিকতা ভারতবর্ষের মূলভূত আত্মা, যা 'চিরপুরাতন কিন্তু নিত্য নতুন'। পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির আবরণ উন্মোচন করে যদি আমরা ভারতীয় শিক্ষার পূর্ণ স্বরূপকে বুঝতে পারি এবং সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে পারি তাহলে ভারতীয় পদ্ধতিতে ভারতকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার পূর্ণ স্বরূপ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হবে।

আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে সক্ষম হবো। এর ফলে সমাজ হবে স্বনির্ভর, দেশ হবে সমৃদ্ধ, সমাজ মানসিকতা হবে বলিষ্ঠ। আর এই ভারতীয় শিক্ষার পূর্ণ স্বরূপ, তার বিকাশ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা— এই বিষয় নিয়ে নিরন্তর সাধনায় ব্রতী রয়েছেন গুজরাটনিবাসী শ্রীমতী ইন্দুমতী কাঠদরে। তিনি গুজরাটের বীসনগরের সিনিয়র কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা। তিনি বিদ্যাভারতীর অখিল ভারতীয় মহামন্ত্রী এবং অখিল ভারতীয় বিদ্বৎ পরিষদের সংযোজক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। এছাড়াও তিনি প্রজ্ঞাপ্রবাহের কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠের সদস্যা। ইনি 'গুরুগৌরব পুরস্কার', 'শিক্ষাভূষণ পুরস্কার' ছাড়াও বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বর্তমানে ইনি 'পুনরুত্থান বিদ্যাপীঠ'-এর কুলপতি হিসেবে ক্রিয়ারত রয়েছেন। পুনরুত্থান বিদ্যাপীঠ শিক্ষার ভারতীয়করণ করার কাজ করে চলেছে এবং এই নিরিখে ভারতীয় শিক্ষা বিষয়ক অধ্যয়ন, অনুসন্ধান, সাহিত্য নির্মাণ, আলোচনা প্রভৃতি করে থাকে। শ্রীমতী কাটদরে ভারতীয় শিক্ষা নিয়ে গবেষণা করেছেন। ভারতীয় সংস্কার, সমাজপদ্ধতি, জীবনযাপনশৈলী নিয়ে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন এবং সম্পাদনার কাজ করে চলেছেন। ভারতীয় শিক্ষা নিয়ে তাঁর আকরগ্রন্থ 'ভারতীয় শিক্ষা গ্রন্থমালা' ৫টি খণ্ডে ইতিমধ্যেই হিন্দিতে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি হলো— (১) ভারতীয় শিক্ষা : 'সংকল্পনা ও স্বরূপ', (২) 'শিক্ষা বা সমগ্র বিকাশ প্রতিমান', (৩) 'ভারতীয় শিক্ষা বা ব্যবহারিক আয়াস', (৪) 'পশ্চিমিকরণ সে ভারতীয় শিক্ষা কী মুক্তি' এবং (৫) 'বৈশ্বিক সংকটোঁ কা নিবারণ ভারতীয় শিক্ষা'। ভারতীয় মূল্যবোধের উপর আধারিত জাতীয় শিক্ষানীতি (National Education Policy) ও পাঠ্যক্রম (Curriculum) কী হওয়া উচিত তার সুস্পষ্ট রূপরেখা এই গ্রন্থগুলিতে তুলে ধরা হয়েছে। শ্রীমতী কাটদরের 'ভারতীয় শিক্ষা গ্রন্থমালা' বাংলা ভাষায় 'স্বস্তিকা'র এই সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। —স্ব: স:।

এই বিশ্বে অনেক রাষ্ট্র আছে এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই নিজ নিজ স্বভাব রয়েছে। রাষ্ট্রের স্বভাব অনুযায়ী তার স্বধর্ম রচিত হয়। স্বভাব ও স্বধর্ম অনুযায়ী প্রত্যেক রাষ্ট্রের জীবন ও জগৎকে দেখা নিজ নিজ দৃষ্টি রয়েছে। ওই দৃষ্টি অনুযায়ী প্রত্যেক রাষ্ট্রের জীবনশৈলী বিকশিত হয়, জনগণের মানসিকতা তৈরি হয়, ব্যবহার নিরূপিত হয় , ওই ব্যবহারের অনুরূপ ও অনুকূল ব্যবস্থাসমূহ রচিত হয় এবং জীবন চালিত হয়।

ভারতও একটি রাষ্ট্র। তার নিজস্ব জীবনদৃষ্টি আছে। একে ভিত্তি করেই তার জীবনশৈলী বিকশিত হয়েছে। সেই অনুসারে তার জীবন যুগ যুগ ধরে আসছে।

রাষ্ট্রের শিক্ষা এই জীবনদৃষ্টি অনুসারেই হয়ে থাকে। এরূপ হওয়ার কারণে শিক্ষা জীবনদৃষ্টিকে পুষ্টও করে থাকে। এজন্য শিক্ষার বিচার করার সময় জীবনদৃষ্টিরও বিচার করা আবশ্যক।

ভারতীয় জীবনদৃষ্টির প্রধান বিষয়গুলো এরকম :

জীবন এক অখণ্ড :

ভারতের দৃষ্টি সর্বদাই সমগ্রতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। যে কোনো ঘটনা বা স্থিতির বিষয়ে খণ্ড খণ্ড করে বিচার না করাই ভারতের স্বভাব। জীবনকেও ভারত এক ও অখণ্ড মনে করে। ভারত জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। জন্মের সঙ্গে জীবনের আরম্ভ হয় না, মৃত্যুর সঙ্গে এর অন্তও হয় না। একের পর অন্য জন্মের জীবন অখণ্ডভাবে চলতে থাকে। এক জন্ম ও অপর জন্মের জীবন পৃথক হয় না। অনেক জন্মে ওটা একই থাকে। কেবল জন্ম-জমান্তরেই নয়, জগতে দৃশ্যমান অসংখ্য পদার্থেও জীবন একই থাকে। এর অর্থ হলো এক জন্মের পরিণাম অন্য জন্মের ওপর পড়ে থাকে। আমাদের এই জন্মের জীবন পূর্ব জন্মের পরিণাম এবং এই জন্মের পরিণামস্বরূপ আগামী জন্ম হতে যাচ্ছে। এর মধ্যে কর্ম, কর্মফল ও ভাগ্যের কর্মসিদ্ধান্ত তৈরি হয়। এই সিদ্ধান্ত বলছে যে, আমরা যে কর্ম করি তার ফল ভোগ করতেই হয়। কিছু কর্মের ফল তাৎক্ষণিক তো কিছু কর্মের

ফল কিছু সময় পরে ভোগ করতে হয়। যতক্ষণ তা ভোগ না করা হচ্ছে ততক্ষণ তা সংস্কাররূপে সঞ্চিত থাকে আর চিত্তে সংগৃহীত হতে থাকে। এই জন্মে ভোগ না করলে আগামী জন্মে তা ভোগ করতে হয়। কর্মফল ভোগ করতে করতে নতুন কর্ম তৈরি হতে থাকে। কর্মের ভিত্তিতে পুনর্জন্ম হয়ে থাকে। কর্মের ভিত্তির ওপর জীবনভর কেমন ভোগ হবে তা নিশ্চিত হয়। কর্মসিদ্ধান্তের সঙ্গেই শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা দ্বারা প্রতিপাদিত নিষ্কাম কর্ম, কর্মফলের অপেক্ষা ছেড়ে দিয়ে মুক্তির সিদ্ধান্তও বোঝা যায়। জীবনের গতিবিধিসমূহকে বোঝাবার এই জন্ম হচ্ছে পুনর্জন্মের সিদ্ধান্ত যা ভারতীয় জীবনদৃষ্টির এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

এই জগৎ অসংখ্য পদার্থ ও জীবের সঙ্গে যুক্ত। এসব কিছু নিজের মূল রূপে এক, কেননা তা একই আত্মতত্ত্বের বিস্তার। যেমন গম দ্বারা প্রস্তুত সব পদার্থেই মূল তত্ত্ব গম, যেমন সোনা দ্বারা প্রস্তুত সব অলংকারের মধ্যে মূল বস্তু সোনা একই থাকে, ঠিক সেভাবেই জগতে দৃশ্যমান অসংখ্য পদার্থে মূলতত্ত্ব একই থাকে। একথা বুঝেই ভারতীয় জীবনব্যবস্থা রচিত হয়েছে।

জগৎ পরমাত্মার বিশ্বরূপ :

ভারতীয় চিন্তাধারায় জীবনের মূল তত্ত্বকে অনেক নামে বলা হয়েছে। কোথাও ব্রহ্ম, কোথাও পরব্রহ্ম, কোথাও আত্মা, কোথাও পরমাত্মা, কোথাও ঈশ্বর, কোথাও পরমেশ্বর, কোথাও পরম চৈতন্য, কোথাও জগৎনিয়ন্তা, আবার কোথাও সোজাসুজি ভগবান বলা হয়েছে। যার যেমন মতি তেমনই নাম ওই মূল তত্ত্বকে মনীষীগণ দিয়েছেন। এ বিষয়ে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, 'একম্ সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি' অর্থাৎ সত্য এক, মনীষীগণ একেই ভিন্ন নাম দিয়ে থাকেন। এই মূল তত্ত্ব অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অকল্প, অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, অজর, অমর হয়ে থাকে। এই জগৎ অথবা সৃষ্টি সেই অব্যক্ত তত্ত্বেরই ব্যক্ত রূপ। ব্যক্ত রূপ বিবিধতা দ্বারা যুক্ত। এখানে রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ ইত্যাদির অপরিমিত বিবিধতা রয়েছে। সৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থ অন্য পদার্থ থেকে কোনো না কোনো রূপে ভিন্ন। কিন্তু দৃশ্যমান ভিন্নতার মধ্যে মূল

তত্ত্বের একত্ব রয়েছে। মূল একত্ব ও দৃশ্যমান ভিন্নতা হচ্ছে একই তত্ত্বের দুই রূপ। এই আধারভূত ধারণার ওপর ভিত্তি করে ভারতীয় জীবনব্যবস্থা তৈরি হয়েছে।

এই সৃষ্টির সমস্ত পদার্থ একাত্ম সম্বন্ধ দ্বারা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। একাত্মতার ব্যবহারিক রূপ হলো চক্রীয়তা তথা পরস্পর-পরিপূরকতা সমস্ত পদার্থ গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। পদার্থসমূহের গতি বৃত্তাকার। এসব কিছু যেখান থেকে আসে আবার সেখানেই ফিরে যায়। এভাবে একটি বৃত্ত পূর্ণ করার পর অন্য বৃত্ত আরম্ভ হয়ে থাকে। সকল পদার্থ যা থেকে তৈরি হয়েছে পুনরায় তাতে বিলীন হয়ে যায়। গতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতার সঙ্গেই পরম্পরাবলম্বন তথা পরস্পর পূরকতাও সৃষ্টিতে দেখা যায়। এই সব তত্ত্বের কারণে সব এক অপরের পোষক হয়ে থাকে। সব একে অপরের সহায়ক এবং একে অপরের ওপর আধারিত— এই তত্ত্বকে মনে রেখে ভারতের জীবনব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

সৃষ্টিতে দৃশ্যমান অথবা অদৃশ্য অস্তিত্বধারী সকল পদার্থের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। এর কোনো না কোনো প্রয়োজন আছে। এই তত্ত্বকে স্বীকার করে ভারতের জীবনশৈলীর বিকাশ হয়েছে। তার স্বতন্ত্র সত্তাকে স্বীকার করা, তার সমাদর করা এবং ওই স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করা মানুষের কর্তব্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মূল অব্যক্ত তত্ত্বের ভাবাত্মক রূপ হচ্ছে প্রেম, সৌন্দর্য, জ্ঞান ও আনন্দ। যেভাবে আত্মতত্ত্ব সৃষ্টির বিবিধতা রূপে ব্যক্ত হয়েছে ঠিক সেই প্রকারেই এসব তত্ত্বও সৃষ্টিতে বিবিধ রূপ ধারণ করে ব্যক্ত হয়েছে। এসব তত্ত্বকে মূল তত্ত্ব মনে করে ভারতীয় জীবনব্যবস্থা রচিত হয়েছে। জগতে যত সম্বন্ধ আছে তার আধারভূত হচ্ছে প্রেম, যত সৃজন ও নির্মাণ আছে তার আধারভূত হচ্ছে সৌন্দর্য, যত রকমের কাজ আছে তার পরিণাম হচ্ছে আনন্দ এবং যতরকম অনুভব আছে তার আধারভূত তত্ত্ব হচ্ছে জ্ঞান। সর্বত্র এই তত্ত্ব সমূহের অনুভব করাই হচ্ছে জীবনকে জানা।

এর উদাহরণ আমাদের সর্বত্রই চোখে পড়ে। কলা, কাব্য সাহিত্যের সৃজনে আনন্দ তো আসেই কিন্তু প্রাত্যহিক পরিচ্ছন্নতা, মাটির পাত্র তৈরি করা, রুগ্নের পরিচর্যা করা, কাপড় সেলাই করা ইত্যাদির মধ্যেও সেই আনন্দের অনুভূতি থাকে। রাজা-প্রজার, মালিক-কর্মচারীর, শিক্ষক-বিদ্যার্থীর সম্বন্ধের মধ্যে আত্মীয়তা রয়েছে। আত্মীয়তাই প্রেম। প্রেমের কারণে সৃষ্টিতে সৌন্দর্য দেখা যায়। আত্মীয়তার মাধ্যমে বিবিধ স্বরূপের ভেতরে একত্বের বোধ রয়েছে— এটিই জ্ঞান।

এটিই হলো আধ্যাত্মিক জীবনদৃষ্টি। আত্মতত্ত্বকে অধিষ্ঠানরূপে স্বীকার করে যা স্থিত রয়েছে সেটাই আধ্যাত্মিক। ভারতের পরিচিতিও বিশ্বে আধ্যাত্মিক দেশরূপে রয়েছে।

সমগ্র জীবনদৃষ্টি :

এই জীবনদৃষ্টি ব্যবহারিক দিক থেকে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। এই দৃষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠিত জীবনব্যবস্থা গৃহসংস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। গৃহসংস্থার আধারই হচ্ছে একাত্মতা। গৃহে প্রতিষ্ঠিত একাত্মতার বিস্তার 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' পর্যন্ত হয়ে থাকে। সবাইকে নিজের ভাবা, কেননা সবাই এক, এটি ব্যবহার সম্বন্ধে মূলসূত্র হয়ে ওঠে। বেদে বলা হয়েছে— 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ এ সবই হলো বাস্তবে ব্রহ্ম। এই বেদবাক্য আমাদের সর্বত্রই প্রতীত হয়। এই সৃষ্টিতে যেমন জ্ঞান আছে, তেমনি অজ্ঞানও আছে। সত্য যেমন আছে, তেমনি অসত্যও আছে। জড় যেমন আছে, তেমনি চৈতন্য আছে। ভালো যেমন আছে, তেমনি খারাপও আছে। ইষ্ট যেমন আছে তেমনি অনিষ্টও আছে। আলো যেমন আছে তেমনি অন্ধকারও আছে। অর্থাৎ সৃষ্টির অব্যক্ত রূপ একই ব্যক্ত রূপ দ্বন্দ্বাত্মক। এই দুই পক্ষ সর্বদা একে অপরের সঙ্গে থাকে। এই দুইয়ের মধ্যে

একটিও পূর্ণরূপে নষ্ট হয় না। সময়ে এই দুইয়ের মধ্যে একটি প্রভাবী থাকে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় না। এই তত্ত্বকে স্বীকার করেই জীবনের সকল ব্যবস্থা রচিত হয়েছে।

তথাপি জ্ঞান, সত্য, ধার্মিকতাকেই ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে আদর্শ মানা হয়েছে। কেউ কাউকে অসত্য বা দুর্জনতার ব্যবহার করতে প্রোৎসাহিত করবে না। সবাই ভালো হতেই চাইবে। এরকম হওয়ার জন্য ঋষিগণ তপস্যা, দান, যজ্ঞ, সাধনা, জ্ঞান প্রাপ্তির সর্বদা উপদেশ দিয়ে থাকেন।

সমাজজীবনকে আধ্যাত্মিক অধিষ্ঠান দেবার জন্য যোগসূত্র অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ— এই পাঁচ সার্বভৌম মহাব্রতগুলো পালন করবার উপদেশ দিয়ে থাকে। অর্থাৎ ভারতীয় জীবনদৃষ্টিতে অধ্যাত্ম ও ভৌতিকতা একে অপরের থেকে পৃথক নয়। আধ্যাত্মিকতা সকল ভৌতিক রচনাতেই অনুস্যূত থাকে। তত্ত্ব ও ব্যবহারের একাত্মতা এই জীবনদৃষ্টির বিশিষ্ট লক্ষণ। এই জন্যই সমাজ জীবনের জন্য সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতি, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।

খণ্ডিত ভাবে নয়, বরং সমগ্রতার মধ্য দিয়েই জীবনকে দেখবার কারণে এখানে সংঘর্ষ নেই। বরং সমন্বয় আছে। এখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, বরং পরমেষ্টি কেন্দ্রিক চিন্তাধারা রয়েছে। এই জন্যই একের বিরুদ্ধে অন্য কেউ এমন ধারণা তৈরি হয় না। একজন পারে তো অন্যজন পাবে না এমন ব্যবস্থা নেই। সবাই নিজের আবশ্যকতা অনুযায়ী পাবে এমন শ্রদ্ধা আছে। যাদের তিনি জন্ম দিয়েছেন তাদের সবারই আবশ্যকতার পূর্তি প্রকৃতি করে থাকে। এমন ধারণা অনুসরণেই যে কোনো মানুষ অথবা প্রাণী অথবা পদার্থের আবশ্যকতার পূর্তি করবার কাজ মানুষও নিজের ধর্মরূপে গ্রহণ করেছে।

সৃষ্টি পরমাত্মার বিশ্বরূপ এবং মানুষ তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। শ্রুতি বলছে, পরমাত্মা মানুষকে নিজের প্রতিরূপে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ শ্রেষ্ঠ আর সে কারণেই শেষ সৃষ্টি তার উপভোগের জন্য তৈরি হয়েছে— এটা ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নয়। শ্রেষ্ঠ বলেই তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোটো ও হীন প্রাণী ও পদার্থসমূহের রক্ষা এবং পোষণ করা তাদের কর্তব্য। জীবনের সব ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আভিজাত্যের সঙ্গে কর্তব্য ও দায়িত্ব, ছোটোদের ক্ষেত্রে রক্ষা করবার অধিকার যুক্ত রয়েছে। সমাজের ধারণার জন্য এটি ভারসাম্য রক্ষার উত্তম ব্যবস্থা।

ভারতীয় জীবনদৃষ্টি সমগ্রতায় স্থিতিশীলতাকে দেখে থাকে। এর আরও একটা লক্ষণ এই যে, এটা বৈশ্বিক বিচারই করে থাকে। সচরাচর জগৎকে একসঙ্গে বিচার করে থাকে। এজন্যই ব্যক্তি তো দূরের কথা রাষ্ট্রও কখনও একথা ভাবে না যে তার একারই বিকাশ হোক অথবা তার একারই সবকিছু প্রাপ্ত হোক আর অন্যদের যা হবার হোক। 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ' এমনটাই তার কামনা হয়ে থাকে। জীবনের সব ব্যবস্থাই এই ভাবনা অনুসারেই রচিত হয়ে থাকে।

সংঘর্ষ নয় সহঅস্তিত্ব :

সংঘর্ষের মূল হচ্ছে প্রতিযোগিতা। এর পরিণাম হিংসা এবং অতঃপর বিনাশ। ভারতের সামাজিক আচরণের প্রস্থানবিন্দুই হলো অহিংসা। যার মধ্যে হিংসা ও বিনাশের স্থান নেই। এ কারণেই ভারত চিরঞ্জীবী হয়ে রয়েছে। এই জীবনদৃষ্টি অনুসারে যদি বিশ্ব চলে তবে পরিবেশ দূষণ, ধর্ষণ, পরাধীনতার মতো মহাসংকট দূর হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই দৃষ্টি সহঅস্তিত্ব স্বীকার করে। জগতে যত সম্প্রদায়, পরম্পরা, শৈলীসমূহ রয়েছে তাদের সবাইকেই ভারত সম্মান করে এবং যারা সহঅস্তিত্বকে মানে না তাদের সঙ্গে সমায়োজন করবার কলাও এর অবগত রয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক জীবনদৃষ্টিকে সরলতা, দারিদ্র্য, তপশ্চর্যা, সন্ন্যাস ইত্যাদির সঙ্গে যোগ করে দেখা হয়। ভৌতিকতার সঙ্গে এর বিরোধ রয়েছে এমনটা প্রতিপন্ন হয়ে থাকে। ভারতের দার্শনিক ইতিহাস এটা সিদ্ধ করেছে যে, আধ্যাত্মিক জীবনদৃষ্টি সর্বাধিক সমৃদ্ধির জনক। বর্তমানে বিকাশের যতগুলো মানদণ্ড আছে, তার সবকটিই এর মধ্যে সমাবিষ্ট হয়ে যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি ভাবী প্রজন্মকে শেখানোর কাজ শিক্ষা ব্যবস্থাকেই করতে হবে। এজন্যই শিক্ষার অধিষ্ঠানও আধ্যাত্মিক হওয়া দরকার। আধ্যাত্মিক অধিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষাই হচ্ছে ভারতীয় শিক্ষা। (ক্রমশ)

(ভাষান্তর : সূর্য প্রকাশ গুপ্ত, প্রাক্তন অধ্যাপক)

অখণ্ড ভারতের স্মরণ মনন আজ বড়ো প্রয়োজন

প্রবাল

স্বাধীনতা দিবসে সবাই শুভেচ্ছা পাঠায়, 'হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে'। সেটা নিয়ে আমি একটা দ্বন্দ্বে ভুগি, বুঝতে পারি না কী করব। এটা ঠিক, ওইদিন বহু শতাব্দী পর আমার দেশ স্বাধীন হয়েছিল। আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ওইদিন তো আরও কিছু হয়েছিল। সেগুলোর জন্যও কি 'হ্যাপি' হব? ওইদিন আমার ভারত মায়ের অঙ্গচ্ছেদ হয়েছিল। রক্তে লাল হয়েছিল ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, পদ্মা, সিন্ধু। আমার প্রাণের যশোহর, বিক্রমপুর, চট্টগ্রাম, লাহোর, তক্ষশীলায় আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল। লক্ষ নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে কেনা ওই দিনটাতে মিষ্টি খেয়ে ঘুড়ি ওড়াতে কোথাও যেন বাধো-বাধো ঠেকে। ছিন্নমূল উদ্বাস্তু আমার পূর্বপুরুষদের যন্ত্রণা ভুলতে পারি না। যারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে, যাদের দেশ ভুলে গেছে, তাদের কথা বারবার মনে পড়ে। মিষ্টি গলা দিয়ে নামে না। সেটা কি আমার দোষ?

আরেকটা প্রশ্ন মনে জাগে। ভারতের ইতিহাস তো দুশো বছরের নয়, লক্ষ বছরের ইতিহাস। এই লক্ষ বছরে কতগুলো স্বাধীনতা দিবস এসেছে রাষ্ট্রের জীবনে? রাজা সুহেলদেব যেদিন তুর্কিদের তাড়িয়েছিলেন, সেটাও তো স্বাধীনতা দিবস ছিল, তাই না? সম্রাট স্কন্দগুপ্ত যেদিন হূণদের তাড়িয়েছিলেন? শিবাজী যেদিন স্বরাজ্য ঘোষণা করেছিলেন? হরিহর বুক্ক যেদিন স্বাধীন বিজয়নগরের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন? লাচিৎ বরফুকন যেদিন সরাইঘাটে মোগলদের জলসমাধি দিয়েছিলেন? মার্তণ্ড বর্মা যেদিন কোলাচলে ডাচ আর্মাডার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিলেন? নেতাজী যেদিন আন্দামান নিকোবরে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেছিলেন? মৈরাংয়ে তেরঙ্গা উড়িয়েছিলেন? সেই স্বাধীনতা দিবসগুলে কেন উদ্‌যাপন হয় না?

স্বাধীনতা কোনো একটা পাথরে খোদাই করা শব্দ তো নয়। আজ আমরা স্বাধীন, আগামীকাল আবার পরাধীন হয়ে যেতে পারি। যদি আমরা প্রস্তুত না হই, সতর্ক না হই, যদি আমরা ইতিহাস ভুলে যাই।

সবার পছন্দের সুন্দর সুন্দর কথা বলে রাজনীতি হয় না। রাজনীতির জন্য প্রয়োজন, অপ্রিয় হলেও সত্য কথা বলা। সেই অপ্রিয় সত্যের পক্ষে কিছু লোক দাঁড়িয়ে পড়বে, কিছু লোক বিপক্ষে। এই দুই পক্ষের বৈচারিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের রাজনীতি নির্ধারিত হবে। দেশহিতকারী সঠিক বিতর্ক সৃষ্টি এবং সেই বিতর্ককে উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হলো সফল রাজনীতিকের বৈশিষ্ট্য। এই ক্ষমতাটা আমাদের দিলীপদার বিলক্ষণ রয়েছে। এবারের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের একটি ফেসবুক পোস্ট এরকমই একটি বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। দিলীপদা লিখেছেন, ‘‘আজকের এই পুণ্য প্রভাতে আমাদের সংকল্প হোক অখণ্ড ভারতের পুনর্নির্মাণ। বন্দে মাতরম্। ভারতমাতার জয় হোক। অখণ্ড ভারতের পূজারি ঋষি অরবিন্দের জন্মজয়ন্তীতে

জানাই অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য ও প্রণাম।”

প্রথমেই বলি, সাবাশ দিলীপদা। অন্তত একজন রাজনৈতিক নেতা তো আছে আজ এদেশে, যিনি অখণ্ড ভারতের মানচিত্রটা ভুলে যাননি। ঋষি অরবিন্দের উপাস্য দেবীকে ভুলে যাননি।

পোস্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিছু লোক বিরোধিতায় মেতে উঠেছে, ততোধিক লোক সমর্থনে। এটাই এখন দরকার। রামনাম ভক্তিতে করুক বা ঘৃণায়, দুটোতেই রামনামের মনন হয়। অখণ্ড ভারতের মনন আজ বড়ো প্রয়োজন। অখণ্ড ভারত আমাদের খণ্ডিত হওয়ার ইতিহাস মনে করিয়ে দেয়। সে ইতিহাস ভুলে গেলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঠেকাবো কী করে? তাছাড়া, অখণ্ড ভারতের ধ্যান তো সৃষ্টিছাড়া কোনো আকাশকুসুম কল্পনা নয়। বহু মনীষী জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিশ্বাস রেখেছিলেন, অখণ্ড ভারত বাস্তবে রূপ নেবে। স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর বলেছিলেন, ভারতের ইতিহাসে বহু শকস্থান হূণস্থান তৈরি হয়েছে, তারা বিলুপ্তও হয়েছে। পাকিস্তানেরও সেটাই ভবিতব্য। তিনি কি ভুল ছিলেন? পণ্ডিচেরী অরবিন্দ আশ্রমে আজও অখণ্ড ভারতের মানচিত্র পূজিত হয়। তার সামনে অনুষ্ঠান হয়, ফ্ল্যাগ মার্চ হয়। খণ্ডিত নয়, অখণ্ড ভারতের মানচিত্র। ঋষি অরবিন্দ সেই মানচিত্রকেই তো তাঁর আরাধ্যা দেবী মেনেছিলেন! দেবীর রূপ কি আমাদের সুবিধেমতো খণ্ডিত হতে পারে?

কিন্তু সত্যিই কী অখণ্ড ভারতের পুনর্নির্মাণ সম্ভব? অটক থেকে কটক এক রাজশক্তি, এক শাসন? একাগ্রতা, ধ্যেয়নিষ্ঠা ও নিরন্তর প্রচেষ্টা থাকলে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। নিরন্তর কার্যকরী আঘাতে কঠিন পাথরও একদিন ভেঙে চুরমার হয়। একটা কথা সত্যি, এটা গায়ের জোরে হবে না। তাছাড়া, শুধু ওই মাটি নয়, ওই মাটির পথভোলা মানুষগুলোকেও তো আমাদের চাই। তাদের বাদ দিয়ে দেশ গড়ার কাজ সম্পূর্ণ হবে কী করে?

তাহলে কীভাবে এই একীকরণ হতে পারে?

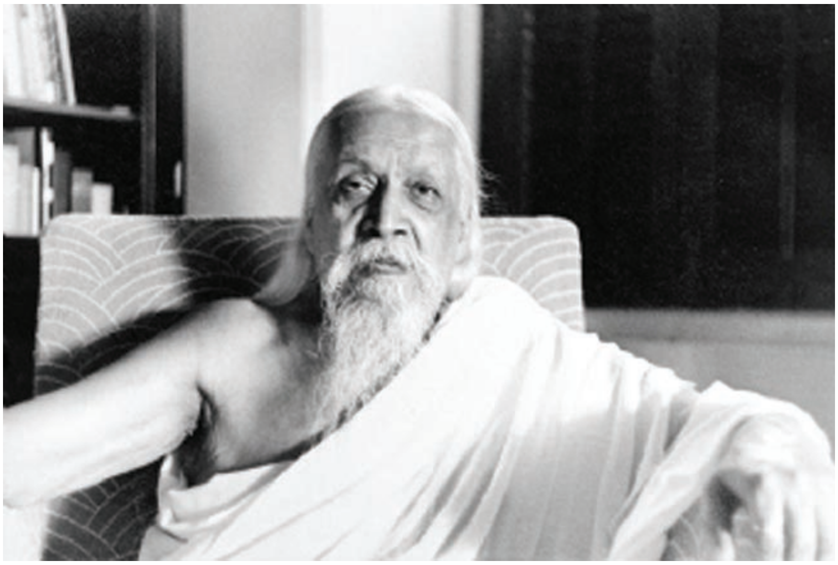

প্রথমে তো আমাদের মধ্যে একীকরণের ইচ্ছেটা চাই, স্বপ্নটা চাই। স্বাধীনতার সময় নেপাল ও বালুচিস্তান ভারতে যোগ দিতে চেয়েছিল। চাচা নেহরু রাজি হননি। কী মনে হয়, চাচার জায়গায় ঋষি অরবিন্দ থাকলে রাজি হতেন না? সমস্যাটা ছিল, অখণ্ড ভারত নিয়ে চাচার কোনো স্বপ্ন ছিল না। তাই, অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখা ছাড়লে চলবে না। সুযোগ ঠিক এসে যাবে। সাফল্য যে পথে চলে, সবাই সেই পথে চলে। এককালে তুর্কিরা সফল ছিল। আজ তারা ব্যর্থ। আজ যদি ভারত সাফল্যের প্রতীক হয়ে ওঠে, সবাই ভারতকেই অনুসরণ করবে। ভারতে যোগ দিতে আগ্রহী হবে। পূর্বপুরুষদের পরম্পরার দান মাথা পেতে নিতে এগিয়ে আসবে তারা, দলে দলে। আমাদের ধমনীতে একই রক্ত বইছে, সেই রক্তের টান তুর্কিনাচে ভুলে থাকা কিছুদিন সম্ভব, চিরদিন নয়। কোভিড পরবর্তী বিশ্ব এক নতুন বিশ্ব হবে। নতুন পরিস্থিতি, নতুন প্রযুক্তি, নতুন সুযোগ। কে ভেবেছিল, আরব আমিরাতের সঙ্গে ইজরায়েলের বন্ধুত্ব হবে? তুর্কির সঙ্গে ঝগড়া বাধবে গ্রিসের? চীন-তুর্কি-পাকিস্তান-ইরান, এক নতুন অক্ষ নির্মাণ হচ্ছে। এদিকে খনিজ তেলের লাভের গুড় তলানিতে এসে ঠেকেছে, অন্যদিকে আরব-তুর্কি সংঘর্ষের আশঙ্কায় কাঁপছে মধ্যপ্রাচ্য। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ফাঁপরে পড়বে ওয়াহাবি-সালফিরা, লাভ হবে ভারতের।

এ এক অসম্ভব সম্ভবের কালখণ্ড। কে ভেবেছিল রামমন্দির নির্মাণ এই চোখে এই দেহে দেখে যেতে পারব? ভারতের ঘটনাবলী বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে নব জোয়ার আনবে। পিছু হটা শেষ, এগিয়ে চলা শুরু। এই সময় লক্ষ স্থির রাখতে হবে। সুযোগ ঠিকই এসে যাবে।

অখণ্ড ভারত ছিল অর্থনৈতিকভাবে সফল একটা মডেল। এই মডেলে অন্তর্ভুক্ত হলে সবারই লাভ। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ব্যবসা হয় দুটি প্রণালী দিয়ে— ভারতের পূর্বে মলাক্কা প্রণালী ও ভারতের পশ্চিমে হরমুজ প্রণালী। ভারত খণ্ডিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই দুই প্রণালী থেকে দূরে সরে এসেছি। অখণ্ড ভারত এই সমস্যার নিরসন

করবে। একদিকে মধ্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা, অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে বাধাহীনভাবে ব্যবসা চালানো সহজ হবে। মধ্যযুগে ভারতের, বিশেষত বঙ্গদেশের পতনের মূল কারণ ছিল ভারত মহাসাগরের সর্বত্র ভারতীয় নৌসেনার প্রভুত্ব প্রয়োজন, ভারতের সার্বভৌমত্ব প্রয়োজন। যাতে আমাদের বাণিজ্যপোতগুলো নির্দ্বিধায় কারোর চোখ রাঙানি ছাড়াই মহাসাগর পাড়ি দিতে পারে। শক্তিশালী স্বয়ংসম্পূর্ণ ভারতের এই শক্তিটুকু দরকার।

পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির একীকরণ কীভাবে হয়েছিল? দুই পক্ষের মধ্যে বিভেদ ছিল মতাদর্শের। যেদিন পূর্ব জার্মানি কমিউনিজম ত্যাগ করল, সেদিনই পূর্ব জার্মানি পশ্চিম জার্মানিতে বিলীন হলো। মিলনের সেই মডেল তো উদাহরণ স্বরূপ আমাদের সামনেই রয়েছে। ভারত ও পাকিস্তান দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হয়েছিল, সেই মতাদর্শটা ধ্বংস হলেই কার্যসিদ্ধি হবে। সমস্যাটা ধর্মীয় নয়, সমস্যাটা সাংস্কৃতিক। সমস্যাটা আইডেন্টিটির। ইন্দোনেশিয়া কিন্তু তার আইডেন্টিটি বদলায়নি। কারেন্সি নোটে তারা গণেশের ছবি ছাপায়, এয়ারলাইন্সের নাম রাখে 'গরুড়'। শুনেছি দেশ স্বাধীন হতে তারা নিজেদের দেশের নাম 'ইন্ডিয়া' রাখতে চেয়েছিল। ভারত ততদিনে নামটা নিয়ে নেওয়ায় তারা নাম রাখে 'ইন্দেনেশিয়া'। আজও নাকি সে দেশের রাষ্ট্রপতির কাজের ঘরের দেওয়ালে ভারতীয় মাজাপাহিত সাম্রাজ্যের মানচিত্র টাঙানো রয়েছে। পাকিস্তান-বাংলাদেশে এই বোধদয়, এই চেতনা প্রয়োজন।

আমার স্থির বিশ্বাস, অখণ্ড ভারত একদিন না একদিন বাস্তবে রূপ নেবেই। জানি না, সেই দিনটা এই চোখে এই দেহে দেখে যেতে পারব কিনা। তবে স্বপ্ন দেখা ছাড়তে আমি রাজি নই।

তাই, স্বাধীনতা দিবস আমার কাছে 'অখণ্ড ভারত দিবস'। এই দিনটা যত না আনন্দের, তারচেয়ে বেশি বিষাদের। ধ্যেয়নিষ্ঠার, প্রতিজ্ঞার প্রস্তুতির। আরেকটা পরাধীনতা যেন আর না আসে। পার্টিশনের, গণহত্যার কালো দিনগুলো যেন আর ফিরে না আসে। যতদিন না ভারতমাতার গৌরবময়ী অখণ্ড রূপ আবার জগৎসভায় বিশ্বগুরুর আসনে বসছে, পনেরোই আগস্ট মিষ্টি খেয়ে আনন্দ করার সুযোগ আমাদের নেই। ■

বিশেষ আবেদন

বর্তমান করোনা মহামারীর ভয়াবহ পরিস্থিতিতে স্বস্তিকা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। www.eswastika.com এতে ইন্টারনেট সংস্করণ নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।

স্বস্তিকার সকল প্রচার প্রতিনিধি, পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি বিশেষ আবেদন, আপনারা স্বস্তিকার ইন্টারনেট সংস্করণটি আপনার পরিচিতদের মধ্যে হোয়াটস্‌অ্যাপ বা ই-মেলের মাধ্যমে পৌঁছে দিয়ে স্বস্তিকার প্রচারে আমাদের সহযোগিতা করুন। —*ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা*

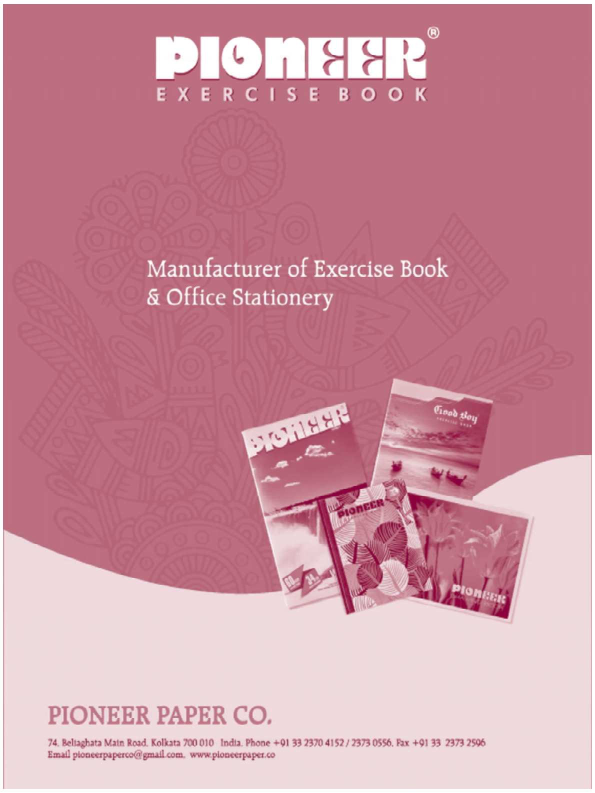

এই দেশে দাঙ্গার অধিকার কাদের?

দেবযানী হালদার

জন্মাষ্টমীর সন্ধ্যা ৭টা। বেঙ্গালুরু। সিলিকন ভ্যালিতে শান্তির পরিবেশ। হঠাৎ রাস্তায় উন্মত্ত জেহাদি জনতার 'আল্লাহ আকবর' ও 'নারা-এ-তকদীর'-এ খানখান হয়ে গেল শান্তির বাতাবরণ। ভেঙে পুড়িয়ে ফেলা হলো কংগ্রেস বিধায়ক অখণ্ড শ্রীনিবাস মূর্তির বাংলো। আক্রান্ত হলো থানা ও পুলিশ। জ্বালিয়ে দেওয়া হলো অসংখ্য বাড়ি। থানা তছনছ হয়ে গেল যা আইন রক্ষাকারীদের জায়গা।

কারণ : একটা ফেসবুক পোস্ট। এক শান্তির ছেলে বশীর আদিয়ার বশীর প্রথমে হিন্দু দেবী লক্ষ্মী ও তার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর 'মর্ফড পিকচার' পোস্ট করেছিল। সেই ফটো অত্যন্ত আপত্তিকর ছিল। পোস্ট কন্নড় ভাষায় বিখ্যাত ভজন 'ভাগ্যদা লক্ষ্মী বড়াম্মা' সহ ছিল। এই ভজন অন্যান্য অনেক শিল্পী-সহ বিখ্যাত ধ্রুপদী সংগীত শিল্পী ভীমসেন যোশীও গেয়েছেন। এই পোস্টের কমেন্টে কংগ্রেস বিধায়ক অখণ্ড শ্রীনির্বাসর মূর্তির ভাগ্নে নবীন একটি ফটো কমেন্ট পোস্ট করে যা মহম্মদ সম্বন্ধীয়। পোস্টে মহম্মদ ও আয়েশার ফটো দেখানো হয়। মহম্মদ সম্বন্ধে কোনো ফটো নাকি ইসলাম বিরুদ্ধ।

পরিণতি : কেজি হাল্লি ও ডিজি থাল্লি

থানা আক্রমণ করে জেহাদি জনতা। দলিত বিধায়কের বাড়ি ভেঙে ফেলা হয় প্রথমে। তারপর আগুন লাগানো হয়। দমকলের গাড়িও পোড়ানো হয়। এই ঘটনায় ৩ জন মৃত। ১০০ জন আহত। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন পুলিশও আছে। কর্ণাটকের মন্ত্রী এ. অশোকের বিবৃতি অনুযায়ী ডিসিপিকে বন্দি করে রাখা হয়। তাঁর গাড়িতে আগুন লাগানো হয়। এমনকী পুলিশ কোয়ার্টারেও আক্রমণ করা হয়। রাস্তা অবরোধ করা হয়। পাথর ছোঁড়া হয় যথেচ্ছ। আশেপাশে প্রচুর গাড়িতে আগুন লাগানো হয়।

কিছু প্রশ্ন :

- এই ঘটনা কি নিছক এক দিনের আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ?
- একটা ফেসবুক পোস্টের জন্য পুলিশ প্রশাসনের উপর ভরসা না করে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত?
- হঠাৎ করে এত এত লোকজন এত কম সময়ের নোটিশে জোগাড় করা কতটা সম্ভব?
- সাইবার পুলিশে অভিযোগ করে আইনি ব্যবস্থার জন্য অপেক্ষা করা হলো না কেন?
- কেন এই সম্প্রদায়ের দেশের আইনের উপর বিশ্বাস নেই?
- ধর্ম রক্ষার নামে জাতীয় সম্পত্তি বা মানুষের ক্ষতি করার অধিকার কোন সংবিধান দিয়েছে?
- এত এত লোককে এত তাড়াতাড়ি

জড়ো কারা করলো?

● এত লোকজনের হাতে লোহার রড থেকে অস্ত্রশস্ত্র, পাথর কারা সরবরাহ করলো?

● এই অস্ত্রশস্ত্রের টাকা কে দিল? সেই টাকা এলো কী ভাবে?

● কোনো অথোরিটির সঙ্গে কথা না বলে ডাইরেক্ট অ্যাকশন কেন হলো?

● হিন্দুদের আঘাত করতে পোস্ট করেছিল বশীর আদয়ার বশীর, তার বিরুদ্ধে এরা কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল?

● দলিত বিধায়ককে আক্রমণ করা হলে দলিত মুসলমান ঐক্যের বাজনা কে বাজাবে?

● কংগ্রেস নিজের বিধায়ক না মুসলমান — কার পক্ষ নিয়েছে?

● বেছে বেছে বিজেপি শাসিত রাজ্যে হলে তার ব্যাখ্যা আলাদা হয় কেন?

● কংগ্রেস বিধায়কের ভাগ্নে হঠাৎ এই পোস্ট করল কী কারোর থেকে নির্দেশ পেয়ে?

● সাধুদের পিটিয়ে যখন মারা হয়েছিল, হিন্দুরা কাউকে আঘাত করলে কীভাবে তার বিশ্লেষণ করা হতো?

না, এর কোনো যথাযথ উত্তর অফিসিয়ালি এখনও পাওয়া যায়নি, হয়তো যাবেও না। এরকমটাই এদেশে হয়ে আসা দস্তুর। এটাই ইতিহাস, এটাই ভবিষ্যৎ। ওদের ধর্মানুভূতি বজায় রাখার দায়িত্ব ওদের, আইনেরও নয়। দেশের আইনশৃঙ্খলা শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য যারা আইন মেনে চলে। আর যারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে চলেছে বরাবর, তারা অবশ্য কখনও দাঙ্গার দায়িত্ব নেয়নি।

অন্য ধর্মের প্রতি এত বিদ্বেষ, এত ঘৃণা নিয়ে এরা দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরু, যে কোনো শহরে অনায়াসে দাঙ্গা লাগিয়ে দেয়। ১০ জানুয়ারি টাইমস নাউ চ্যানেলে একটি ভিডিয়ো ফুটেজ দেখানো হয়েছে যাতে রামমন্দির নির্মাণের বদলা হিসেবে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করবে। ওরা পৃথিক 'মুসলমান স্টেট' দাবি করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যাতে স্বাধীনতা দিবসের দিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে না পারেন, তার প্রচেষ্টা চলেছে সর্বতোভাবে। মুসলমান ভাই-বোনদের আহ্বান জানানো হয়েছে এর উদ্দেশ্যে। ওই দিন রাত্রে ১০-৪৫ নাগাদ সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে লেন-দেনের ছবি। ফান্ডিং তো আছেই, কেরলের গোল্ড স্মাগলিং মনে করিয়ে দেয় অনেক কিছু। প্রশ্ন অনেক, উত্তর নেই।

১১ ও ১২ আগস্টের মাঝখানের রাত দুটোর সময় কংগ্রেসের ন্যাশনাল সেক্রেটারি ও আইটি-ইন-চার্জ জাকিয়া খান একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন। যাতে দেখা যায় একটি মন্দিরের বাইরে মুসলমান ছেলেরা মানববন্ধন করে মন্দিরটিকে বাঁচানোর জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে তাড়াতাড়ি আপলোড করার কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ যা হয়েছে সবটাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এমন ঘটনা আমরা আগে দেখেছি দিল্লির দাঙ্গা, অ্যান্টি সিএএ আন্দোলনের সময়। এমন মানববন্ধন কিছু নতুন নয়। অভিনব তো মোটেই নয়। যারা সন্ধ্যেবেলায় এমন তছনছ করল পুরো শহর, পুলিশ ও তাদের পরিবারের আর্তনাদ যাদের মধ্যে একটুও দয়ামায়া তৈরি করেনি, যারা এটিএম থেকে গাড়ি, ভাঙচুর করেছে সব। পুলিশকে ধাওয়া করে বেসমেন্টেও চড়াও হয়েছে, যাদের জন্য শান্ত একটা শহরে কারফিউ জারি হয়ে গেল, তারা হঠাৎ করে একটা মন্দিরের বাইরে মানববন্ধন করে তাকে বাঁচানোর ভিডিয়ো শুধু ভাইরাল হলো। আবার বাঁচাবে তাদের সম্প্রদায়ের হাত থেকেই। মন্দির হিন্দু ভাঙবে না। শুধু তাই নয়, প্রতিটি নিউজে তাদের ধর্মের উল্লেখ পরিষ্কার ভাবে করে দেওয়া হলো। অথচ কারা মেরেছিল, কারা প্রথমে পোস্ট করেছিল, না তাদের নাম প্রকাশ করা হয়েছে, না তাদের ধর্ম প্রকাশ করা হয়েছে। এই ঘটনায় যারপরনাই উৎফুল্ল হয়েছে লিবারেল ও সেকুলার গোষ্ঠী। মানববন্ধনের জয়গান গাইতে গিয়ে হ্যাজের পর হ্যাজ নেমে গেছে। অথচ দাঙ্গার জন্য ন্যূনতম নিন্দাসূচক একটা বাক্য খরচ করেনি।

বেঙ্গালুরুর মানববন্ধনের আগে আরও মানববন্ধন হয়েছে।

প্রথম ঘটনা : এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লিতে দাঙ্গার সময় মুসলমানরা মন্দির বাঁচাতে এমনই এক মানববন্ধন তৈরি

করেছিল। তাদের ভয় ছিল যে পাছে হিন্দুরা নিজেরাই নিজেদের মন্দির ভেঙে মুসলমানদের দায়ী করে।

দ্বিতীয় ঘটনা : জানুয়ারি ২০২০ সালে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টে শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হয়, সেখানে অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এই আইনের ভুল ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন ইসলামি সংগঠন দিল্লির শাহিনবাগে প্রতিবাদের নামে দেশের রাজধানীর জনজীবন স্তব্ধ করে দেয়। এই প্রতিবাদ চলাকালীন এক আম আদমি পার্টির সমর্থক গুলি চালালে মুসলমান মহিলারা মানববন্ধন তৈরি করেছিল।

হিন্দু এলাকায় এদের খাবার সরবরাহ করা, কোথাও হিন্দু বিধবাকে বাঁচানো, কোথাও মন্দির ভাঙার পর মূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার খবর মিডিয়া ফলাও করে প্রকাশ করে। কিন্তু ওই খাবার সরবরাহ করার কারণ যে দাঙ্গা সেটা ওই মুসলমানরা করেছিল একথা কেউ বলে না। মন্দির ভাঙার খবর বেরোলেও কারা ভেঙেছিল তাদের ধর্ম পাওয়া যায় না কোনো ময়নাতদন্তে। কিন্তু মূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় ধর্মের উল্লেখ থাকে পরিষ্কার হরফে। দিল্লির দাঙ্গার সময় মুসলমানরা দায়ী এ কথা না লিখলেও কত দয়ালু মুসলমান যে কত হিন্দুর প্রাণ বাঁচিয়ে 'মসিহা' হয়েছে, সে খবরের প্রচার চলেছে জোর কদমে।

কোন মিডিয়া প্রথম ফেসবুক পোস্টে হিন্দুধর্ম ও প্রধানমন্ত্রীর ঘৃণ্য যে ভুয়ো ফটো পোস্ট হয়েছিল, তার উল্লেখ পর্যন্ত করেনি। নিজেদের বেলায় ফেসবুক পোস্টে এরা নিজেদের কাজকে জাস্টিফাই করে আর অন্যদের আক্রমণ করে নিজেরা ভিকটিম সাজে এবং অন্যদের বেলায় চুপ থাকে। প্রথম যখন পোস্ট হলো তখন প্রধানমন্ত্রীর গরিমা, হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতির জন্য কারোর কাছে কোনো মূল্য ছিল না। এরা নিজেদের বেলায় এত রিজিড কিন্তু অন্যের বেলায় নীরব, 'নিজের বেলায় দাঁতকপাটি, পরের বেলায় আঁটি শুঁটি'। আইনি প্রক্রিয়ার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ অপেক্ষা করতে পারে, সংখ্যালঘু হলে 'নারা-এ- তকদীর' বলে নিজেদের হাতে আইন তুলে নেবার এই দ্বিচারিতার অধিকার দেওয়া হয়েছে যেন। তারা তাদের ধর্ম রক্ষা করবার জন্য অন্য সমাজকে আক্রমণ করতে পারে, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করতে পারে, লুট করতে পারে, দাঙ্গা করতে পারে, আগুন জ্বালাতে পারে, দেশে অস্থির পরিবেশ তৈরি করতে পারে। সাংবিধানে মৌলিক অধিকার যেখানে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে এই দেশের সমস্ত নাগরিক তাদের ধর্ম পালন করতে পারবে। কিন্তু সেটা শুধু এদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। মালদার কালিয়াচকে দু' লক্ষ জেহাদি জনতা ধর্ম রক্ষাথে বেরিয়ে পুলিশ থানা জ্বালিয়ে দেয়। অ্যান্টি সিএএ আন্দোলনের সময় আমরা দেখেছি আইনের ভুল ব্যাখ্যা করে তারা দু'মাস ধরে রাজধানী অচল করে রেখেছিল। এদিকে সাধুদের পিটিয়ে মেরে ফেললেও আমরা দুদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু পোস্ট করার পর ভুলে যাই। জম্মুর এক অখ্যাত কাঠুয়ার এক মন্দিরে আসিফা নামে একটি মেয়েকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলে কত সহজে সমগ্র হিন্দু সমাজ, মন্দির সবাইকে ধর্ষক বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 'হিন্দু সন্ত্রাস' বলে একটা অধ্যায় শুরু হয়েছিল মালেগাঁও ব্লাস্টের মিথ্যা ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুধু হিন্দুর যাতে বদনাম হয়। যে কোনো মিডিয়ায় মুসলমান দাঙ্গাকারীর নাম থাকে না, হিন্দু হলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু মানববন্ধন হলে সেখানে মুসলমান উল্লেখ করা হয়, খুব সচেতন ভাবে।

একপক্ষ সবসময় আগুন জ্বালাবে আর আরেক পক্ষ শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এটা কোনো কাজের কথা নয়। হয় মানসিকতার পরিবর্তন হোক, নাহলে এইসব মানববন্ধন নামে নাটকের পটকথা তৈরি বন্ধ হোক। দাঙ্গার অধিকার যার, দাঙ্গার দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, ছোটোবেলায় রিফিউজি কলোনি থেকে কেউ এলেই গল্পের বিষয় হতো, ''ওঃ ভাগ্যিস আমাদের রহমত, জুবের ছিল, তাই প্রাণ হাতে করে ইন্ডিয়া চলে আসতে পেরেছিলাম সবাই।'' যেন যারা তাড়িয়েছিল তাদের নাম 'রাম, শ্যাম, যদু' ছিল। স্বীকার করে নাও, রহিম তাড়িয়েছিল, রহমত রাতের অন্ধকারে সীমান্ত পার করিয়ে দিয়েছিল। আসলে সবটাই অধিকারের খেলা, কখনো ধর্মের অধিকার, কখনো ধর্মরক্ষার অধিকার, কখনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার অধিকার। আর এই করতে করতে কখন যে 'দাঙ্গার অধিকার' পেয়ে যায়, আমরা জানতেই পারি না।

আমাদের এই সব মানববন্ধন চাই না। আমাদের মন্দির বাঁচানোর কোনো দরকার নেই। মন্দির ওদের নয় আমাদের 'আমানত'। মন্দির ভাঙছে যারা তাদের এই সব বুজরুকি না করে বিদ্বেষ ছড়ানো বন্ধ করার দিকে নজর দিক, মন্দির ভাঙার মতো পরিস্থিতি উদ্ভব হবে না। এই দেশে দাঙ্গার অধিকার যার, মানববন্ধন নামে মন্দির বাঁচানোর ভণ্ডামি তাদের না করাই ভালো। নিজেদের ইমেজ ঠিক করতে মানববন্ধনের গল্প না তৈরি করে পাথর ছোঁড়া থেকে বিরত হলেই দেশে প্রকৃত শান্তি বজায় থাকবে। একপক্ষ সবসময় আগুন জ্বালাবে আর আরেক পক্ষ শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এটা কোনো কাজের কথা নয়। হয় মানসিকতার পরিবর্তন হোক, নাহলে এইসব মানববন্ধন নামে নাটকের পটকথা তৈরি বন্ধ হোক। দাঙ্গার অধিকার যার, দাঙ্গার দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। ∎

বাংলাদেশে হিন্দুদের বাঁচার উপায় কী?

শিতাংশু গুহ

নাইজেরিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী গত মার্চে বলেছেন, 'আমার দেশে কোনো কোভিড-১৯ রুগি নেই'। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলেন, 'হাউ ইট ইজ পসিবল?' তিনি সহজ উত্তর দিলেন, 'আমাদের কোনো টেস্টিং যন্ত্রপাতি নেই, তাই কোনো রুগিও নেই?' বাংলাদেশে কোনো হিন্দু হিন্দু নির্যাতন হয় না। কারণ বড়ো বড়ো মিডিয়া বা ইংরেজি কাগজগুলো তা প্রকাশ করে না। ছোটো ছোটো পত্রিকায় নির্যাতনের খবর মাঝে মাঝে বের হয়, তা কেউ আমলে নিতে চায় না। তাই, প্রশাসন, ধর্মীয় গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিনিয়ত, ক্রমবর্ধমান হিন্দু বা অন্য সংখ্যালঘু নির্যাতন হলেও বাংলাদেশ একটি 'চমৎকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির' দেশ।

দেশে হিন্দুরা প্রতিদিন নির্যাতিত হচ্ছেন বা দেশে প্রকট সংখ্যালঘু সমস্যা আছে, তা সরকার বা বেশিরভাগ মুসলমান স্বীকার করেন না বা করতে চান না। স্বীকার করুন বা না করুন, সমস্যা তাতে উবে যাবে না। বরং ঘনীভূত হবে। বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের মানুষ ছলে-বলে-কৌশলে দেশ থেকে হিন্দু বা অন্য সংখ্যালঘুদের বিতাড়নের জন্যে সর্বদা সচেষ্ট। সংখ্যালঘুরা আগে ভাবতো আওয়ামি লিগ বা শেখ হাসিনা তাঁদের আশ্রয় বা ভরসাস্থল। এখন তা ভাবে না। বরং বলে, সংখ্যালঘুর রক্তে সকল বড়ো বড়ো দলের হাত রঞ্জিত। সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন ফরিদপুরের জমিদারের 'দয়াময়ী' হাউজ বা প্রাসাদ দখল করেন। ওই সময় আবদুল গাফফার চৌধুরী নিউইয়র্কে ছিলেন। তাকে একথা জানালে তিনি হেসে বলেন, 'হিন্দুর জমি গনিমতের মাল'। তাই হয়তো মুসলমানরা বলে, হিন্দু থাকলে মেয়ে পাবো, গেলে জমি পাবো।

বাংলাদেশের হিন্দু বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাঁচার উপায় কী? ১৯৪৭ সাল থেকে নির্যাতিত হতে হতে এঁরা এখন জীবন্মৃত। পাকিস্তান বা আফগানিস্তান অনেকটা হিন্দুশূন্য। মহাভারতের 'গান্ধার' নামে দেশটি হচ্ছে আজকের আফগানিস্তান। দেশটিতে এক সময় সবাই হিন্দু ছিল। এখন হিন্দু হাতে গোনা। পাকিস্তানে হিন্দুর অবস্থা শোচনীয়। বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে দেড় কোটি হিন্দু ছিল, মোট জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। সরকারি হিসাব মতে বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা এখনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। মোট জনসংখ্যা বেড়ে ১৬ কোটি হয়েছে, হিন্দু বাড়েনি। এর তিনটি কারণ হতে পারে,

এক, হিন্দুরা নপুংসক। দুই, হিন্দুদের মেরে ফেলা হয়েছে। তিন, তাদের জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। সরকার বা যে কেউ এই তিনটির একটিও স্বীকার করবেন ন। তাহলে হারিয়ে যাওয়া হিন্দুরা কোথায়? মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে কোনো হিন্দুর ভারত যাওয়ার কথা নয়। স্বাধীন বাংলাদেশে হিন্দুদের সুখে-শান্তিতে বসবাস করার কথা। বাস্তবতা হচ্ছে, সংখ্যালঘু হিন্দু সংখ্যাগুরু মুসলমানের অত্যাচারে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে বা এখনো হচ্ছে। এটাই সত্য। সব মুসলমান অত্যাচার করেছে, বিষয়টি তা নয়, তাদের একটি অংশ এবং শাসনযন্ত্র হিন্দুদের দেশত্যাগে বাধ্য করেছে। এ দৃশ্যটি বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে হুবহু একইরকম, কারণও একই। ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশে হিন্দু থাকে কী করে?

হিন্দুরা ভারত যাও বা ভারত তোমাদের দেশ— এ বাণী শুনেনি এরকম হিন্দু বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া কঠিন। কোনো সরকারই চায়নি হিন্দু বা সংখ্যালঘুরা থাকুক। ডিজিটাল যুগে অবশ্য চাইলেও দুই কোটি ধর্মীয় সংখ্যালঘুকে খেদানো কঠিন হবে। থাকতে তো হবেই, যাবে কই? ১৩০ কোটি মানুষের দেশ ভারতে গিয়ে কী করবে? এখনো বাংলাদেশে যত হিন্দু আছে, পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি দেশে তত মানুষ নেই। এত হিন্দু বা সংখ্যালঘুকে ভারতে ঠেলে দেওয়া যাবে না, মেরে ফেলা যাবে না বা ধর্মান্তরিত করা যাবে না। তাই, হিন্দুদের বাংলাদেশেই থাকতে হবে, বাংলাদেশের মাটি ধরেই উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।

ছাত্রজীবনে আমরা স্লোগান দিয়েছি, 'লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই'। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের লড়াই করেই বাঁচতে হবে। 'সারভাইবেল অব দি ফিটেস্ট'। আমাদের প্রজন্ম হয়তো এখনো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। পরবর্তী প্রজন্ম তা বিশ্বাস না করলে কী তাঁদের দোষ দেওয়া যাবে? মাত্র চারশো বছর আগে বঙ্গপ্রদেশে তেমনি কোনো মুসলমান ছিল না। বঙ্গভূমি হিন্দুদের ছিল। বঙ্গভূমি তাঁদের চৌদ্দ পুরুষের ভিটা। সেই হিন্দুদের 'ভূমিপুত্র' অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশে তাঁদের ভিটেমাটি ছাড়া করতে করতে এখন এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, যে আর পশ্চাদপসরণের সুযোগ নেই। হয় মরতে হবে, নয়তো লড়াই করে বাঁচতে হবে। এ বাঁচার লড়াই। যুগ পালটেছে, পাকিস্তান বা আফগানিস্তানের মতো বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য হবে না। বরং যাঁরা আগে ভারতে গেছেন, তাঁরা যে ফিরে আসবেন না, এ গ্যারান্টি কোথায়?

শান্তি চাই। দেশের সব হিন্দুকে চিরদিনের জন্যে অত্যাচার করা যাবে না। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান একমাত্র সমাধান। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি প্রধান দিলীপ ঘোষের কাছে একজন প্রস্তাব দিয়েছেন, ভারত বাংলাদেশি হিন্দুদের দ্বৈত-নাগরিকত্ব দিক। তাঁর মতে এতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন কমবে, হিন্দুদের মনোবল বাড়বে। তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য বা দেশ গঠনে ব্রতী হবেন, সমানভাবে দুই দেশে বসবাস করবেন এবং এতে উভয় দেশ লাভবান হবে। তিনি এও বলেন, বাংলাদেশ যদি ভারতের মুসলমানদের নাগরিকত্ব দিতে চান, তাও হতে পারে। দেশবিভাগ হয়ে বাঙ্গালি হিন্দু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, মুসলমানরা লাভবান হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তান বা বাংলাদেশে হিন্দুরা ধ্বংসপ্রায়। তাই হয়তো স্বর নীচু হলেও পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বিনিময়ের কথা মাঝে মধ্যে শোনা যায় বই কী! ঢাকা-দিল্লি সম্মত হলে কতকিছুই হতে পারে। ■

বিশেষ নিবন্ধ

নেহরুভিয়ান সোশ্যালিজম এবং নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর ভারত

ডাঃ আর এন দাস

ইতিহাস ও পৌরবিজ্ঞানে পড়া সোশ্যালিজমের সঙ্গে আকাশ- পাতালের পার্থক্য ছিল ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গে , কেরল তথা সারা ভারতে প্রবর্তিত সোশ্যালিজমের নামে যে নৈরাজ্য ও লালঝান্ডার তাণ্ডব। সোশ্যালিজম বলতে বোঝায়, এমন এক প্রক্রিয়া যাতে উৎপাদন পদ্ধতির মালিকানা থাকে জনগণের হাতে। উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থায় সমতা ও স্বার্থশূন্যতাই হচ্ছে সমাজবাদের মূলকথা। সমাজের সমস্ত বিষয়েই সামর্থ্য, শক্তি ও বুদ্ধির ভিত্তিতেই প্রতিটি মানুষ বিভক্ত। ক্লাসের সবাই সমান বুদ্ধিমান হয় না। প্রকৃতির নিয়মে বুদ্ধিমত্তার তারতম্য থাকে বলেই প্রাপ্ত মার্কসের ভিত্তিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়। কিন্তু মার্কসবাদ মানে সাম্যবাদে সবাই সমান। প্রতিভা বা সামর্থ্যের কোনো মূল্য নেই সেখানে। মানুষ হচ্ছে সমাজের উপযোগী উৎপাদনাকারী যন্ত্র মাত্র। ফলাফলের সমানতা থাকায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য পুরস্কারের কোনো স্থান নেই। ফলত জনগণের মধ্যে অকর্মণ্যতা ও আলস্য দেখা দেয়। প্রতিযোগিতাহীন বাজারে সামগ্রীগুলি গুণবত্তাহীন ও নিম্নমানের হয়। উদাহরণ, চীনের তৈরি সস্তার কম টেকসই সামগ্রী। হাওড়ার জুটমিলগুলি এবং দুর্গাপুরের কলকারখানা বন্ধ হয়েছিল এই কারণেই। শ্রমিকরা জানতো ধর্মঘট করে বাড়িতে বসে থেকে মালিককে ধমকিয়ে, হত্যা করে, কলকারখানা বন্ধ করে, পার্টির নেতার সাহায্যে সামান্য মাসিক বেতন পাওয়া যাবে। কয়েক দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, কেরল, তামিলনাড়ু, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মুসলমান গুন্ডা, মাওবাদী, সিপিএম এবং সমাজবাদী পার্টির উর্দিহীন বেতনভোগী

সৈনিক তথা ক্যাডারের অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যের কথা বিদেশি সংবাদমাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছিল। আজও ভ্রষ্ট নেতারা নির্বাচনে জয়লাভের জন্য জনগণকে নিঃশুল্ক জল, বিদ্যুৎ, যানবাহন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলোভিত করে। মধ্য ও উচ্চবর্গীয়ের উপর অত্যধিক কর চাপিয়ে, জোরজবরদস্তি করে সম্মতি আদায় করে নিজেরা সামন্তরাজের সুবিধাভোগ করে চলেছেন। সাম্যবাদীদের নিকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন জ্যোতিবাবু। দিল্লির নির্বাচনে ৭০টির মধ্যে ৬৭টি আসনে কেজরিওয়াল বিজয়ী হন মিথ্যা প্রতিশ্রুতির আশ্রয়ে। এখন মমতা ব্যানার্জি বলছেন, তৃতীয়বারের জন্য ভোটে জিতলে ১১ কোটি রাজ্যবাসীকে ফ্রিতে রেশন দেবেন।

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার কম সুদে 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায়' ঋণের কথা বললে জনগণের মধ্যে তখন কোনো প্রভাব পড়ছে না। অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুতেও নেতারা নির্বাচনের আগে ফ্রি টিভি, ল্যাপটপ ও ফ্রিজের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জিতেছেন। এতে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি নাকি আরও চরম দারিদ্র্যগ্রস্ত করে তোলা? মোদীজী নির্বাচনে এরকম প্রতিশ্রুতি কখনও দেননি। তিনি বরং দেশবাসীকে কর্মক্ষম ও স্বাভিমানী হতে শিখিয়েছেন।

তাই সমাজবাদের স্বার্থশূন্যতার ফাঁকা আওয়াজ আজ স্বার্থপরতায় পরিণত হয়েছে। অখিলেশ যাদবের সামন্ততান্ত্রিক সমাজবাদের উদাহরণ সকলের কাছেই জাজ্জ্বল্যমান। বিলিপত্র, ভরতুকি, ফ্রিবিস ও তুষ্টিকরণের রাজনীতি ভারতের চরম বিপর্যয়ের মূল কারণ। এতে জনগণ হয়েছে পরমুখাপেক্ষী, অলস ও অক্ষম। চরিত্রহীন ভ্রষ্ট নেতারা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশ, ধর্ম, সভ্যতা, ভাষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে দুর্নীতি, কালোবাজারি, ঘুষখোর, অবৈধ মুসলমান অনুপ্রবেশ ও সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। মাওবাদী ছত্রধর মাহাতোকে মমতা ব্যানার্জি তৃণমূলে শামিল করে নিরীহ গ্রামবাসীদের ভয় দেখিয়ে, ধর্ষণ ও খুন করে তৃতীয়বারের জন্য মসনদে বসতে চান। কর্মোদ্ধারের পর মাওনেতা কিসেনজীর

মতোই তিনিও এনকাউন্টারে নির্ঘাত মারা যাবেন। আর 'তথ্যসচিব' আইপিএস রাজীবকুমার নিপুণ দক্ষতায় সেসব গোপন করবেন।

অলস, অক্ষম ও কর ফাঁকি দেওয়া অকর্মণ্য জনগণ চাইছে সরকার ফ্রিতে সবকিছু সরবরাহ করে জনগণের সেবা করুক। সেজন্যই নির্বাচিত সরকারের চাই লোভী ও ভ্রষ্ট প্রশাসন। নৃশংস পুলিশ, তথাকথিত শিক্ষাবিদ এবং সাহেলা রসিদ ও কানাহাইয়া কুমারের মতো ছাত্রনেতা। গ্রিস ও আয়ারল্যান্ডে এটাই হয়েছিল। সরকার ভরতুকি দিয়েই সর্বস্বান্ত হয়েছিল। পৃথিবীর অন্যতম কাঁচা তেলের ভাণ্ডার রয়েছে সমাজবাদী হুগো চাভেজের ভেনেজুয়েলায়। অথচ ২০১০ সাল থেকেই খাদ্যসঙ্কট, নৈরাজ্য, দারিদ্র্য দেশটিকে শেষ করেছে। এরকম পরিস্থিতিতেই উত্তর কোরিয়ার কিমজুন য়ুং বা নেপালের কে পি ওলির মতো স্বৈরাচারী শাসকের উদ্ভব হয়। সরকারি আমলারা যখন আগাপাশতলা দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হয়, যেমনটি হয়েছে তথাকথিত চীনের শাসক শি জিনপিঙের ক্ষেত্রে। প্রচার করা হয় সাম্যবাদী, সৎ, নিষ্ঠাবান, সুনীতিপূর্ণ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন নেতাদের দ্বারা পরিচালিত দেশ। কিন্তু চালাক চীনকে দেখলে বোঝা যায়, বাস্তবে কুটিলতা, ভণ্ডামি ও চালাকি ছাড়া আর কিছুই নেই চীনে। সত্যের অপলাপ এবং ইতিহাসকে বিকৃত করায় দক্ষ নেপালি কমিউনিস্ট কৃষ্ণপ্রসাদ ওলি বলছেন, অযোধ্যা নাকি ভারতে নয়, নেপালেই ছিল। ভারত যেমন মোগল ও ব্রিটিশদের উপনিবেশ ছিল, তেমনই বৌদ্ধদেশ দক্ষিণ কোরিয়া ছিল স্বৈরতন্ত্রী জাপান সম্রাটের অধীন।

ভারত ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পেয়ে আজও উন্নয়নশীল দেশের তকমাযুক্ত। অথচ ১৯৫০ সালে কোরিয়ান যুদ্ধে বিধ্বস্ত দক্ষিণ কোরিয়া আজ বিশ্বের অন্যতম বিকশিত ও উন্নতশীল দেশ। স্বাধীনোত্তর ভারতের বিকাশের শম্বুকগতির পিছনে অনেক কারণ ছিল। প্রধানত, প্রথম প্রধানমন্ত্রী অদূরদর্শী জওহরলাল নেহরুর সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের প্রতি অকুণ্ঠ প্রেম। লেনিন বলেছিলেন, সমাজবাদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে কমিউনিজম। বলশেভিক বিপ্লবের পর ১৯২১ সালে

সংবিধানের পরিবর্তন করে সংখ্যালঘু তুষ্টিকরণের রাজনীতি বন্ধ করে স্বচ্ছ, স্বাভিমানী, অমিতবীর্যশালী, গৌরবময়, সমৃদ্ধ, সাহসী নবভারতের সৃষ্টির জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে।

লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হলে তিনি ঘোষণা করলেন, 'বাজার ও অর্থনীতির উপর সরকারের নিরঙ্কুশ অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ থাকবে। ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সমস্ত কিছুই রাষ্ট্রীয়করণ হবে'। ভারতীয় সংস্কৃতিতে অজ্ঞ, পাশ্চাত্য মতবাদে প্রভাবিত, দূরদৃষ্টি ও পরিকল্পনাহীন, নেহরু সোভিয়েতের মডেলে প্রশাসন ও আমলাগোষ্ঠীকে গড়ে তুলেছিলেন। সেই সোভিয়েতেই মাত্র ৭০ বছরে বিধ্বস্ত হয়ে ১৬টি ভাগে বিভাজিত হয়। সাম্যবাদে ধনী মানে নিকৃষ্টশ্রেণীর পেটিবুর্জোয়া এবং গরিব মানে মহান প্রলেতারিয়েত। সেজন্য নেহরুর এই সমাজতান্ত্রিক রাজ্যপ্রশাসন প্রণালী টাটা-বিড়লারা মেনে নিতে পারেনি। নেহরু 'টাটা এয়ার লাইন্স'কে দেখিয়ে জেআরডিকে বলেছিলেন, মুনাফা হচ্ছে জঘন্য শব্দ। তাই এয়ার ইন্ডিয়াকে রাষ্ট্রীয়করণ করে সরকারি ভরতুকিতে চালিয়ে শেষে সর্বস্বান্ত করা হলো। নেহরুর সঙ্গে মতপার্থক্যের জন্য ঘনশ্যামদাস বিড়লাকে জেলেও যেতে হয়েছিল।

নেহরুর কথায়, সমাজবাদ শুধু জীবনধারণের বিশুদ্ধ পদ্ধতিই নয়, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার নিশ্চিত ও বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানও বটে। স্বাধীনতার সময় ভারতে শিক্ষা ও দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ১২ থেকে ৬৫ শতাংশ ছিল। তিনি ভাবলেন, ধনীবণিকদের কাছ থেকে জোর করে ট্যাক্সের মাধ্যমে টাকা আদায় করে দরিদ্রের মধ্যে বিলিয়ে দিলেই অভাব অনটন মিটে যাবে। ভারতের নির্বাচন রণাঙ্গনে ফ্রিবিজ, ভরতুকি ও তুষ্টিকরণ রাজনীতির প্রথম প্রবর্তক নেহরু। কর্মোদ্যমহীন জনতার মধ্যে লোভী, ভ্রষ্ট নেতার আবির্ভাব ঘটিয়ে দুর্নীতি, কালোটাকা, স্বজনপোষণ ও বশংবদের সূচনা করলেন। প্রতিভার মৃত্যু ঘটিয়ে শ্রমিকদের করা হলো অলস ও অকর্মণ্য। প্রতিযোগিতার জায়গায় সমাজে স্থান পেল অনুমোদন পত্র। স্কুল-কলেজ ও জেএনইউ বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দখল করে নিল ইয়েচুরির মতো কট্টর হিন্দুবিরোধী, পাকিস্তানপন্থী দেশদ্রোহীরা। যে সময়ে সিঙ্গাপুরের জনক লি কুয়ান ইউ ভূবাণিজ্য ও সম্পদহীন ক্ষুদ্র দ্বীপকে উন্নতশীল করেছিলেন, সে সময় মদ্যপ ও চরিত্রভ্রষ্ট নেহরু ভারতের মতো ঐতিহ্যশালী ও গৌরবময় বিশাল দেশকে প্রতিবেশী চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে চিরন্তন যুদ্ধে নিয়োজিত করলেন। অথচ দেশের সামরিক শক্তিবৃদ্ধির কথা চিন্তাও করলেন না। কারাকোরামের ৪৩ হাজার বর্গকিমি আগ্রাসী চীন দখল করলে তিনি বললেন, ওখানে তো শুকনো, ঘাসের একটা পাতাও জন্মায় না। সংযুক্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘ সুরক্ষা পরিষদের স্থায়ী সদস্যতা পেয়েও সে সুযোগ হেলায় হারালেন। ইতিহাস বলে, কোনো দেশ আয়তনে বিশাল হলেই মহান হয় না। সে দেশের নেতৃত্বের চারিত্রিক গুণাবলী, শৃঙ্খলাপরায়ণ জনগণের দৃঢ় মনোবল, অধ্যবসায়, পারস্পরিক সহযোগ ও সংকল্পই দেশটিকে মহান করে।

উদ্যমশীল লি কুয়ান স্বদেশে শিল্প, কারখানাজাত উৎপাদন বাড়িয়ে বিদেশি লগ্নিকারকদের নানা সুযোগসুবিধা, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং করের পরিমাণ হ্রাস করে ডাইরেক্ট ফরেন ইনভেস্টমেন্টের উপর জোর দিয়েছিলেন। মোদীজী এখন সেটা করছেন। আজ তিনি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন নির্মাণে মনোনিবেশ করেছেন। অন্যদিকে, নেহরুর অনবদ্য দান হচ্ছে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত 'লাইসেন্সরাজ', যেটা এখনকার 'সিন্ডিকেটরাজে' পরিণত হয়েছে। তিনি ছিলেন জটিল ও কুটিল আমলাতন্ত্রের জনক। লাইসেন্স ও পারমিট পাওয়ার জন্য ছোটো ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা নির্ভর করত করতো পুলিশ-প্রসাসন, আইন-আদালত,

কোর্টকাছারির উপর। সৃষ্টি হয়েছিল, দুর্নীতি, ঘুসখোর ও কালোবাজারির। বখরা না পেলে কাজই হতো না। তাই টাটাকে সিঙ্গুর ছেড়ে গুজরাটে যেতে হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত শিল্প, কলকারখানা উঠে গেছিল শুধুমাত্র সিপিএমের সমাজবাদের জন্য। ১৯৯১ সালে পি ভি নরসিমহা রাও প্রধানমন্ত্রী হলে, কিছুটা বিকাশ ও উন্নতির গতি ফিরে এসেছিল। অর্থমন্ত্রী মনমোহনজী তাঁর আমলে লাইসেন্সরাজের অন্ত করেন। আজ ভারতে ৬৫ শতাংশ জনসংখ্যার বয়স ৩৫ বছরের নীচে। এই বিশাল যুবশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভারতের ১৪তম প্রধানমন্ত্রী মোদীজীই একমাত্র তিনি স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, স্কিল ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া প্রভৃতি প্রকল্প শুরু করে ভারতকে আজ বিশ্বের পঞ্চম ও এশিয়ায় সবচেয়ে তীব্র গতিসম্পন্ন অর্থনৈতিক বিকাশশীল দেশে পরিণত করেছেন। আজ সারাবিশ্বের ৫৬ শতাংশ আউটসোর্সিং মার্কেটের ভাগীদার ভারত। আমলাতন্ত্রের উপর অঙ্কুশ লাগিয়ে অনেক সহজ ও স্বচ্ছ করেছেন কলকারখানা ও শিল্পকে।

মোদীজী দৃঢ় পদক্ষেপে বিচারালয় সম্পর্কিত আইনের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। যার ফলে উদ্যোগপতিরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, আমলা, প্রশাসন এবং লালফিতার ফাঁস কেটে নতুন উদ্যমে শিল্প ও কলকারখানা খোলার সাহস দেখাচ্ছেন। বিদেশিদের কাছে ভারতে শিল্পোদ্যোগ মানেই ছিল সময় ও অর্থের অপব্যয়। সেই অপবাদ খণ্ডন করেছেন বলেই শিল্পের বিকাশ হয়েছে। তবে এখনও বাকি রয়েছে অনেক কিছু। মানুষের মনে এখনও আনতে পারেননি উদ্যমের জোয়ার। তাই তিনি ২১ জুন, বিশ্ব যোগ-দিবসের মাধ্যমে ফিটনেস ইন্ডিয়ার ডাক দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ডিগ্রি নয়, চাই দক্ষতা'। তবেই সফল হবে ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প ও উদ্যোগের প্রচেষ্টা। দূরদর্শী প্রধানমন্ত্রী সেই উদ্দেশ্য আলাদা এক বিশেষ 'কৌশল, বিকাশ ও উদ্যোমিতা মন্ত্রালয়' খুলেছেন। তাই আজ পারমিট লাইসেন্সরাজের ভয়ে সিটিয়ে থাকা অনেকেই এগিয়ে আসছেন ছোটো-বড়ো নতুন শিল্প ও কলকারখানা খোলার সাহস দেখিয়ে। চীন ৮০-র দশকেই সোশ্যালিজমের ভুলভ্রান্তি বুঝে ক্যাপিটালিজমের দিকে ঝুঁকেছে। সে সময় আমরা শুনতাম, চীনের গ্যাং অব ফোর, লিন পিয়াও এবং রোড টু দ্য ক্যাপিটালিজমের কথা। সমাজবাদের পতনের প্রমাণিত সত্যের কথা সলঝেনিৎসিন ও সাখারভ অনেক আগেই লিখে গিয়েছেন।

ভারতের এক বছর পরে পরাধীন চীন ১৯৪৮ সালে ব্রিটেন থেকে স্বাধীনতা পায়। ভারত আজ পিছিয়ে পড়েছে সুপারপাওয়ার চীনের কাছে অনেক কারণে।

১. নির্মাণ শিল্প : চীন এখন সারাবিশ্বের নির্মাণ জগতের নাভিকেন্দ্র। অ্যামাজন, ওয়ালমার্ট থেকে আরম্ভ করে সারাবিশ্বের সব থেকে সস্তার উৎপাদন সামগ্রী চীনের। ইলেকট্রনিক্স ও হার্ডওয়ার তৈরির ক্ষেত্রে সারাবিশ্ব চীনের উপর নির্ভরশীল। সিমেন্স, হিটারির মতো কোম্পানিগুলিও তাদের ছোটো ইউনিটগুলি আজও চীনেই রেখেছে।

২. শ্রমের মূল্য : শুনতে খারাপ লাগলেও সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, চীনা শ্রমিকরা ভারতীয়দের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি উদ্ভাবনশীল, উদ্যমী ও কর্মদক্ষ।

৩. পরিকাঠামো ও বাণিজ্যবলয় : চীন আমদানি-রপ্তানির সুযোগসুবিধা বাড়ানোর জন্য সিপেক বা ওয়ান-রোড ওয়ান-বেল্টের মাধ্যমে সারাবিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যবাজার খুলে বসেছে। চীন হাইটেক সড়ক ও সেতু, অবাধ বাণিজ্যনীতির সাহায্যে অর্থনৈতিক যুদ্ধে আমেরিকাকে হারিয়ে দিয়েছে। ভারত তারই অনুকরণ করছে রপ্তানি প্রকরণবলয় এবং সফটওয়ার প্রযুক্তির মাধ্যমে।

৪. কৃষি-নির্ভরতা : ভারতের অর্থনীতি এখনও কৃষিভিত্তিক। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকতার সঙ্গে প্রযুক্তির প্রয়োগে আমরা চীনের অনেক পিছনে আছি। কৃষকদের উপযুক্ত, আধুনিক প্রয়োগিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে চীন কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে এনেছে। পক্ষান্তরে ভারতের জিডিপিতে কৃষিক্ষেত্রের অবদান অতি নগণ্য।

৫. স্বনির্ভরতা : মোদীজী ২০১৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরে, অর্থমন্ত্রকে ২৫টি শাখায় ২৫টি বিভিন্ন স্বদেশী উৎপাদনের ক্ষেত্র তৈরি করে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র ডাক দিয়েছেন। আজ কারখানাজাত দ্রব্যের উৎপাদনের বৃদ্ধি ও রপ্তানি অনেক গুণ বেড়েছে। গুজরাট মডেলের মতোই সারা ভারতে বিশেষ করে মণিপুর ও সিকিমের মতো পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে শিল্পপতিদের বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, ২০২৩ সালের মধ্যে ভারত ডিআরডিও-র সাহায্যে ১৫০টি সামরিক সামগ্রী স্বদেশেই উৎপাদন করতে সক্ষম হবে।

৬. চীনা সামগ্রী বর্জন : মোদীজী চীনের ১৫৯ টি অ্যাপ বন্ধ করে বিশ্বনেতৃত্বের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। আজ ভারতের বাজার সস্তার চাইনিজ হার্ড ও সফটওয়ারে পূর্ণ। দেশিয় শিল্প ও কলকারখানার উৎপাদেন সেগুলি অপরিহার্য। দৈনিক ৩ মিলিয়ন টন কাঁচামাল চীন রপ্তানি করলে তবেই ভারতের শিল্প ও কলকারখানা সচল থাকে। এই পরনির্ভরতা কমিয়ে আনার প্রয়াস চলছে। চীনে শ্রম ও পরিবহণ মূল্য ভারতের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় চীনা সামগ্রীর উৎপাদন মূল্যও অনেক কম। ভারতে আছে বেতনভোগী সরকারি শ্রমিক। কিন্তু চীনে শ্রমের মূল্য নির্ধারিত হয় তার উৎপাদনের পরিমাণের উপর। ফলত, বেশি পরিশ্রমের দ্বারা, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করেই চীনা শ্রমিক তার বেতন বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে ভারতে সরকারি ভাতা না পেলে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলিই কলকারখানা বন্ধ করে উৎপাদনকে স্তব্ধ করে দেয়।

৭. ভোটব্যাঙ্ক : ভারতীয় সমাজের মতো সংখ্যালঘু সংরক্ষণ, তুষ্টিকরণ, ধর্ম, বর্ণ ও জাতিতে বিদীর্ণ ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা স্বৈরাচারী চীনকে ভোগ করতে হয়নি। বাক্‌স্বাধীনতাহীন একনায়কতন্ত্রী চীনে সরকারের বিরোধিতা মানেই মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু ভারতে দেশদ্রোহীদের নিজস্ব ইকোসিস্টেম আছে যাতে তারা রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেও মুক্ত থাকবেন সংবিধানের সংরক্ষণে। অর্থাৎ ভারতে ভোটাররা দেশের বিকাশের চেয়ে নিজস্ব ধর্ম, বর্ণ বা জাতির মঙ্গলের জন্য ভারতকে বিদেশি আক্রমণকারীদের হাতে তুলে দিতেও পিছপা হয় না। আমার বিশ্বাস ধমকি দিয়ে, খুনখারাপি করে, প্রশাসন ও পুলিশের ভয় দেখিয়ে এবং সর্বোপরি উর্দিবিহীন ক্যাডারদের সাহায্যে মমতা ব্যানার্জি সিপিএমের মতোই জিততে থাকবেন যতদিন না হিন্দুশূন্য পশ্চিমবঙ্গে ইসলামি শাসনের প্রতিষ্ঠা হয়।

তাই, আমাদের এখনই সংকল্পবদ্ধ হতে হবে , সংবিধানের পরিবর্তন করে সংখ্যালঘু তুষ্টিকরণের রাজনীতি বন্ধ করে স্বচ্ছ, স্বাভিমানী, অমিতবীর্যশালী, গৌরবময়, সমৃদ্ধ, সাহসী নবভারতের সৃষ্টির জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হই।

অতিথি কলম

ঋতু কুমার

চীনা আমদানি আমাদের পরম্পরাগত বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করে দিচ্ছে

কয়েকমাস ধরে আগ্রাসী করোনা মহামারীর সঙ্গে দেশের সীমান্তে চৈনিক আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে চীন থেকে পোশাক-আশাক বা ধর্মীয় উৎসবে ব্যবহৃত হয় ইত্যাদি সামগ্রী আমদানি সংক্রান্ত নীতি ভারতকে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। ভারতের পক্ষে তার ঐতিহ্যগত শক্তি ও বিশেষ দক্ষতায় চীনা জালে ধরা পড়া আটকাতেই হবে। এই সূত্রে ইতিমধ্যেই বিশ্বের বেশকিছু দেশের মানুষ চীনা কৌশলে ধোঁকা খেয়ে তাদের নিজস্ব ট্রাডিশনের সঙ্গে জীবনজীবিকাও হারিয়েছে।

ভারতে কৃষি ক্ষেত্রের পরেই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্র। দেশের সম্পদ বৃদ্ধিতে এই ক্ষেত্রের গুরুত্ব বিশাল সম্ভাবনাময়। ভারতের হ্যান্ডিক্রাফটের খ্যাতি বিশ্ব জোড়া। ঘরে ঘরে এই শিল্পের প্রসার আছে। এই পরম্পরা বংশানুক্রমে চলে আসছে এবং এর বৌদ্ধিক স্বত্বও একান্তই ভারতের। এই বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন মানুষদের ১ কোটি ৬০ লক্ষ এই ক্ষেত্রে জীবিকা অর্জন করে।

ইউরোপ মহামারীর কবলে পড়ার সময় ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স প্রথম দিকেই আক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রে একটা বিষয় তাদের মধ্যে কমন ছিল। সেখানকার নিরন্তর সমৃদ্ধ হয়ে চলা ফ্যাশন শিল্প এবং এই ক্ষেত্রে নব নব উদ্ভাবন ও বিলিয়ন ডলারের পেটেন্ট নিয়ে শিল্পকে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে, এক্ষেত্রে ইউরোপ একচেটিয়া হয়ে ওঠে। এই ধরনের নিত্যনতুন ডিজাইনের বিলাস দ্রব্যগুলির ক্ষেত্রে তারাই নিয়ামক এবং মার্কেটিং থেকে উদ্ভাবন সবই নিয়ন্ত্রণ করে থাকত।

সমগ্র বিশ্বের ফ্যাশন ডিজাইনিং ও উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল ইউরোপের হাতে। বিশেষ ধরনের মূল্যাবান জিনিসগুলিকে তারা নিজস্ব জায়গায় উৎপাদন করত। তুলনায় ওই একই ধরনের জিনিসের নকল তৈরি করে, ব্যবসার মার্জিন আরও বাড়াতে তারা সস্তায় চীনে দর্জিদের কাজ দিতে আরম্ভ করল। ক্রমে ক্রমে তাদের লাইসেন্স দিয়ে নিজেদের বিশেষ পোশাক-আশাকগুলি সস্তায় এবং দ্রুত চীনারা যাতে তৈরি করে দিতে পারে সেই ব্যবস্থা বলবৎ হলো। এই ভাবে তারা বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা এই একান্ত নিজস্ব ঘরানার ব্যবসায়িক গোপন কৌশল, তৈরির বিশেষত্ব, প্যাটার্ন ও কৃৎকৌশলের যাবতীয় ট্রিক্স এই ভাড়া করা চীনাদের শেখাল। তারা মালগুলি তৈরি করার পর নিজেদের মালের থেকে অনেক কম দামে এগুলি তাদের কাছ থেকে কিনে আবার বিশ্বময় রপ্তানি করত।

হায়! চীনারা উৎপাদনের কৃৎকৌশল খুব তাড়াতাড়ি রপ্ত করে ফেলল। তাদের হাতে অযাচিত ভাবে আগেই লাইসেন্স থাকার ফলে তারা খুব দ্রুত মেড ইন ফ্রান্স বা মেড ইনট ইটালি বলে অনেক সস্তার মালে বাজার ছেয়ে দিল। দখলও করল। ইটালি যাকে বিলাসদ্রব্য তৈরির স্বর্গদ্বার বলা হতো সেখানেই এই নকল মালের দাপট হু হু করে বাড়তে লাগল। যে পরিবারগুলি চিরাচরিত ভাবে এই সৃষ্টি কর্মে জড়িত ছিল, সস্তার দাপটে তারা হটে যেতে বাধ্য হলো। যাকে বলে ব্যবসা লাটে উঠল। এখন সারা বিশ্বের সস্তায় ভালো ভালো পোশাক- আশাক তৈরির চলতি কথায় যাকে হাব বা নির্দিষ্ট অঞ্চল বলা হয় যেটি কেন্দ্রীভূত এতদিনে কুখ্যাত উহান প্রদেশকে ঘিরে। পাশ্চাত্য দুনিয়া সস্তায় মাল তৈরির ফেরে পড়ে কীভাবে জিনিসের অজান্তেই সম্পূর্ণ আধিপত্য হারিয়ে বসে আছে এখনও তারা সম্যক উপলব্ধি করতে পারছে না। হ্যাঁ আরও ভয়ের কথা, এটা শুধু এই একটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ এমনটা নয়। উজবেকিস্তানের নাম অনেকেই জানেন, মধ্য এশিয়ায় যাযাবর জাতি ও মরুদ্যানের এক চমৎকার সংস্কৃতির ছোট্ট দেশ এটি। অতীতের প্রসিদ্ধ silk route-ও এখান দিয়েই গেছে। এই দেশের রাস্তার ধারে ধারেই ছিল অসাধারণ সব সূচীকর্ম ও সূক্ষ্ম কারুকার্যময় পরিধেয় বস্ত্রের ঘরোয়া সব বিপণী। ব্যবসাদাররা এদের কাছ থেকে চলার পথে মাল সংগ্রহ করে বিশ্বময় যুগ যুগ ধরে বিক্রি করত।

কয়েক বছর আগে এই প্রাচীন সূচীবিদ্যার পরম্পরা সম্পর্কে গবেষণার কাজে আমি এই অঞ্চলে এসেছিলাম। এ প্রসঙ্গে 'ফারগানা উপত্যকা' যেটি ইতিহাসে বাবরের জন্মস্থান নামে খ্যাত, অতীতে ছিল সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠতম সূচীকর্মের পীঠস্থান। কিন্তু এক-আধটা ব্যতিক্রম ছাড়া বস্ত্রশিল্পে যে অসাধারণ মুনশিয়ানার বিচ্ছুরণ দেখা যেত তার ছিটেফোঁটাও এখন আর নেই। এই অঞ্চলের নারীরা 'কাফটান' নামের একধরনের বস্ত্র পরিধান করে যা তাদের ট্রাডিশনের সঙ্গে একেবারেই বেখাপ্পা ও পরিবেশের সঙ্গে বেমানান। এই পোশাকগুলি সবই চীনে তৈরি এবং সেখানকার ডিজাইন করা। সেখানে কিছু কিছু অতীত স্টাইল মাঝে মধ্যে ব্যতিক্রম হিসেবে

চোখে পড়েছে। তাই বলতেই হয় বস্ত্রশিল্প সঠিক অর্থে যদি কোথাও গরিমা নিয়ে বিরাজমান থাকে তা একমাত্র ভারতবর্ষ। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভাবার সময় এসেছে যে ভারতেরও বস্ত্রশিল্পে নিজস্বতা হারাবার প্রবণতা অন্য কোনো দেশের চেয়ে কম নয়। অতীতের দিকে তাকালে দেখা যায় ইংরেজরা বিশ্ব বাজারে তদানীন্তন ২৫ শতাংশ রপ্তানিকে ২ শতাংশে নামিয়ে দিয়েছিল। ভারতীয় ধারায় অনুসৃত বয়নশিল্পকে অনুকরণ করে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী অবধি তারা আধিপত্য চালায়। আশ্চর্যজনকভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় বা পুপুল জয়করের মতো কিছু উদ্যমী মহিলার প্রচেষ্টায় স্বাধীন ভারতে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের পুনরুত্থান হয়। আমরা নজর করলেই দেখতে পাব বেনারসি শাড়ির বাজারে চীনা অনুপ্রবেশ। বেনারসির পাড় দেওয়া নকল তানচোই শাড়ি বাজারে জলের দামে বিকোচ্ছে।

চীন চিরকাল শিকারি স্বভাবের। তাদের সেরিকালচার বহু প্রাচীন, যেমন ভারতে রেশম শিল্প। রেশমি সুতোকে অসাধারণ নৈপুণ্যে হাতে বুনে ভারতে যে শাড়ি তৈরি, হয়তো যা একাধারে হালকা, নরম ও সহজে ভাঁজ করে আশ্চর্যরকম ছোট করে নেওয়া যায়। আমি বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিনীদের পোশাক নির্বাচন ও নির্ধারণে বহু বছর কাটিয়ে দিয়েছি (Miss World, Miss Universe প্রতিযোগিতা)। আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফ্যাশন শোগুলির প্রতিযোগীদের বেনারসি শাড়িতে শরীর মুড়ে উপস্থিত করানোর কথা ভাবতাম। কিন্তু কিছুতেই প্রবাদপ্রতিম চিত্রকর রবি বর্মার ছবির নারীদের পরিহিত বেনারসি কিছুতেই খুঁজে পাইনি। এরপর বেশ কিছু বছর ধরে বেনারসি শাড়ি নিয়ে গবেষণা শুরু করলাম কী করে এক সময়ের শরীর বিভঙ্গের সঙ্গে লেপটে থাকা মোলায়েম শাড়িগুলি পরার পর কঠিন, ফুলে ফেঁপে ওঠা সম্পূর্ণ অপরিধেয় বস্তু হয়ে উঠল তা নিয়ে।

খুঁজতে খুঁজতে আমি এই অধঃপতনের উৎসমুখে পৌঁছলাম। বরাবর ভাগলপুর থেকে হাতে বোনা যে রেশমি সুতো বেনারসে আসতে যাকে 'পাট-বানা' বলা হতো। এর মাধ্যমেই অসাধারণ সৌকর্যময় বেনারসি তৈরি হতো এখন সেই সুতো আসছে চীন থেকে। এর পরিণতিতে বেনারসি শাড়ির ঐতিহ্য তছনছ হয়ে গেছে। বিশ্বে তার চাহিদাও তলানিতে। আজ বেনারসের ঐতিহ্যময় তাঁতঘরগুলির নীরবতা সাক্ষী দেয় সেখানকার বুনকারেরা আজ সস্তায় আমদানি করা চীনা সুতোর মিল খুলেছে। বেনারস কিন্তু পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকালীনভাবে টি কে থাকতেও পারে যদি আমরা সেই প্রাচীন মূল রেশম সুতোকে ফিরিয়ে আনতে পারি। আমাদের নিজেদের কর্ণাটক রাজ্যে 'মালবেরি রেশম' সুলভ্য যেগুলি নরম সূক্ষ্ম, হালকা ও বোনার পর অপরূপ সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠার ক্ষমতা ধরে।

তরাই অঞ্চলের গুটিপোকা থেকে তৈরি 'অহিংস রেশম', অন্য প্রদেশের মুগা ও তসর আমাদের চিরকালীন ঐতিহ্যের সামগ্রী। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, যদি ভারতের অধিকাংশ পরিবারের বধূরা তাদের আলমারিতে একটি করে আসল বেনারসি রাখার গর্ব ধরে রাখতে পারে তাহলে বেনারসের কোনো তাঁতিই আর বেকার থাকবে না।

প্রথমদিকে চীন খুবই কম দামে দেশে নকল রেশম এনে ঢেলে দিত। বাজার ধরার পর ধীরে ধীরে দাম বাড়াতে থাকে। এটি ততদিনে আকর্ষণীয় ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বেনারসির ব্যবসা আজ ফড়েদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এরা আদৌ জানে না আসল জিনিসের কদর। এও জানে না যে তারা যে কারবারে পয়সা রোজগার করছে সেই শাড়ি পরিধেয়র উপযুক্ত নয়। কিন্তু আমাদের দেশকে বরাবরের জন্য চীনের ওপর নির্ভরশীল করে তুলছে একটি নিকৃষ্ট বস্তুর উৎপাদনের মাধ্যমে। চীনে রেশমি সুতোর ওপর সরাসরি নিষেধাজ্ঞা জারি করলে কিছু সময়ের জন্য উৎপাদন অবশ্যই বাধাপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু আমাদের বস্ত্রশিল্পের উৎকর্ষ সাধনে ও বাজার পুনরুদ্ধারে প্রয়োগ করার মতো যেটুকু সংযম নিশ্চিত আছে। কেননা আমরাই তো বিশ্বকে বস্ত্রবয়নের সৌন্দর্য শিখিয়েছিলাম। কোভিড-১৯-এর মহামারী আমাদের সাবধানবাণী দিচ্ছে— ভারত তার মহান ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রশিল্পকে রক্ষা করুক। ময়ূরের অপরূপতাকে যেন কুৎসিত ড্রাগন উদরস্থ না করতে পারে।

(লেখিকা বিশিষ্ট ফ্যাশন ডিজাইনার)

With Best Compliments from-

A Well Wisher

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক প্রদীপ কুমার দে'র মাতৃদেবী অমিতা দে গত ১৯ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। তিনি ২ পুত্র ও ২ নাতনি রেখে গেছেন।

চিঠিপত্র

১৬ আগস্ট শপথ নেবার দিন

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলমানদের কাছে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস বা 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন নামে পরিচিত। আর ইতিহাস চিহ্নিত করেছে 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামে। তখন অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সৈয়দ সুরাবর্দি। সেই সময় বঙ্গপ্রদেশকে পাকিস্তানে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে মুসলমান মহল্লায় ধ্বনি ওঠে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। এই কসাই সুরাবর্দি ছিলেন গান্ধীজীর প্রিয় ছোটো ভাই। তাই তিনি ফন্দি এঁটে হিন্দু সংহারের আয়োজন করেন। ১৯৪৬ সালের ৫ আগস্ট এই সুরাবর্দি শহিদ ছদ্মনাম নিয়ে স্টেটসম্যান পত্রিকায় একটি নিবন্ধ লিখলেন। তার বিষয়বস্তু ছিল 'দাঙ্গা-হাঙ্গামা' এবং 'রক্তপাত যদি মহৎ কাজের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয় তবে সেটা খারাপ নয়'। তাই তিনি পত্রিকায় বুঝিয়ে দিলেন মুসলমানদের কাছে পাকিস্তান দাবি একটি মহৎ কাজের অংশ। একটি উর্দু পত্রিকায় লেখা হয় 'এই রমজান মাসে প্রকাশ্যে কাফেরদের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘর্ষ হবে।' তাই মুসলমান দাঙ্গাবাজদের সুরক্ষার জন্য পঞ্জাব থেকে ৫০০ মুসলমান পুলিশ আনা হয়, ১৬ আগস্ট সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। কলকাতার সমস্ত থানা এবং প্রশাসনিক কর্মকেন্দ্রকে নিষ্ক্রিয় রাখা হয়। যাতে কেউ কোনো প্রশাসনিক সাহায্য গ্রহণ করতে না পারে। এই ব্যাপারে আরেকটি পত্রিকায় দেখতে পাওয়া যায় 'এই রমজান মাসে আমরা মক্কা জয় করি এবং পৌত্তলিকদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করি।' এ ব্যাপারে ছোটো লিফলেট বিলি করা হয় তাতে লেখা ছিল, 'আল্লাহর ইচ্ছায় পাকিস্তান লাভের উদ্দেশ্যে জেহাদ আরম্ভ করার জন্য নিখিল ভারত মুসলিম লিগ এ রমজান মাসকে বেছে নিয়েছে'। মুসলিম লিগের লোকেরা মুসলমান পাড়ায় ১৫ আগস্ট রাত্রিবেলায় ধ্বনি তোলে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে উস্কানির বার্তা পৌঁছায়। ১৬ আগস্ট ভোর না হতেই শুরু হয় দৌরাত্ম্য। শুরু হয় হিন্দুদের দোকানপাট লুটপাট, হিন্দু বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, হিন্দু মা-বোনেদের ধর্ষণ ও নির্বিচারে হিন্দুদের হত্যা। মানিকতলা রাজাবাজার, টেরিটি বাজার, বেলগাছিয়া প্রভৃতি স্থানে শুরু হয় হিন্দুদের ওপর আক্রমণ। ধর্ষণ, হত্যা, অপহরণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ এভাবে তিন দিন চলতে থাকে। মানুষের সহ্যের তো একটা সীমা থাকে। তখন অগ্নি নায়ক গোপাল পাঁঠা ওরফে গোপাল মুখোপাধ্যায় স্বমূর্তি ধারণ করে শুরু করেন পালটা আক্রমণ। কিন্তু গোপালবাবুর নির্দেশ ছিল কোনো নারী বা নিরস্ত্র ব্যক্তিকে আক্রমণ নয়। পালটা আক্রমণে মুসলমান গুন্ডারা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। তখন সুরাবর্দি মহাত্মার আশ্রয় নেয় এবং সেনাবাহিনী তলব করেন। এই দাঙ্গায় হিন্দু নিধন হয় ১০ হাজারের মতো। গৃহহীন এক লক্ষ এবং আহত হয় কুড়ি হাজার। এই দাঙ্গায় মৃতদেহগুলি সৎকার করা সম্ভব হয়নি, শকুন কুকুর শিয়াল কাক ছ'মাসের খোরাক পেয়েছে। এই ইতিহাস ভারতবাসী বিশেষ ভাবে বাঙ্গালি হিন্দুরা চিরদিন মনে রাখবে।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর, নদীয়া।

জঙ্গিদের বিরুদ্ধে জোট গড়ার আহ্বান

সংবাদে প্রকাশ, সারদাপীঠের পরম পূজনীয় শঙ্করাচার্য জঙ্গিদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়েছেন। হিন্দুদের উপর কোনো অত্যাচার হলে কোনো হিন্দু ধর্মগুরু বা তাদের প্রতিষ্ঠান প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসে না। অথচ এদের আশ্রমগুলি চলে হিন্দুদের দানে। বরং অহিংসা পালন করে মার খাওয়া, নারী ধর্ষণ, অপহরণ করার মতো জঘন্য অপরাধের প্রতিবাদ করতে দেখা যায় না এই ধর্মগুরু বা তাদের সংস্থার তরফ থেকে। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি, ইন্দিরা গান্ধী নিহত হওয়ার আগের বছর কাশ্মীরের ইকবাল পার্কে এক জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় সামনের সারিতে থাকা পুরুষরা নিজেদের পুরুষাঙ্গ উন্মুক্ত করে বসে থাকে। এই সংবাদ ভারতের সমস্ত সংবাদমাধ্যম চেপে যায়। তাঁর দল কংগ্রেসও এই নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি। একজন মহিলা প্রধানমন্ত্রীকে পুরুষাঙ্গ প্রদর্শনের অপরাধে একজনও গ্রেপ্তার হয়নি। কারণ এদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলে মুসলমান ভোট হারানোর ভয়। ১৯৯০ সালে ৪ লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিতকে মুসলমানরা বিতাড়িত করেছে, তাদের মেয়েদের ধর্ষণ করেছে, তখন সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ নেতৃবৃন্দ মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিল। অতএব শঙ্করাচার্যের সঙ্গে সহমত হয়ে হিন্দু যুবকদের রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানাচ্ছি।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,
সল্টলেক, কলকাতা-৬৪।

কালিয়াগঞ্জে নদী চুরি!

সম্প্রতি একটা খবরে জানা গেছে— 'কালিয়াগঞ্জে চুরি করে রায়তি সম্পত্তি বানানোয় বন্ধ শ্রীমতী নদী সংস্কারের কাজ।' কালিয়াগঞ্জ 'নদী ও পরিবেশ বাঁচাও' কমিটি উত্তরদিনাজপুর জেলা শাসকের কাছে দরবার করেছে যাতে ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে শ্রীমতী নদীকে সংস্কার করা যায়। তাহলে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে যেমন বাঁচা যাবে অন্যদিকে তেমনি নদীর দুই তীরে বনসৃজনের মাধ্যমে শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিও ঘটানো যাবে। জেলাশাসক সেইমতো শ্রীমতী নদী সংস্কারের জন্য নির্দেশ জারি করে কালিয়াগঞ্জ বিডিওকে দ্রুত কাজ শুরু করতে বলেন।

বিডিও ভূমিসংস্কার দপ্তরে গিয়ে কাগজপত্র দেখে চমকে উঠেন। তিনি দেখেন, শ্রীমতী নদী বলে কাগজপত্রে কিছুই

নেই। যা আছে তা পুরো নদীটাই বিভিন্ন ব্যক্তির নামে রায়তি সম্পত্তি হয়ে আছে। রায়তি সম্পত্তির মালিকরা গোটা নদী জুড়ে বছরের পর বছর ধরে ধান চাষ করে আসছে। এখন প্রশ্ন উঠেছে, একটা নদীকে কীভাবে রায়তি সম্পত্তিতে পরিণত করতে পারল? কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, 'রাজ্য প্রশাসন ও জেলা প্রশাসন এত বড়ো একটা ঘটনার রহস্য খুঁজে বের করতে পারছে না?' এই ঘটনা জানার পর স্বভাবতই পুরনো একটা গল্প মনে পড়ে গেল। গল্পটি রেলের।

রেলের ইঞ্জিন জল খাবে, তাই একটা পুকুর কাটতে হবে। সেজন্য টাকা স্যাংশনের জন্য হেড অফিসে চিঠি গেল। টাকা এল, পুকুরও কাটা হলো। কয়েকমাস পর আবার চিঠি গেল হেড অফিসে, পুকুর বোঝাতে হবে, কারণ কলোনির গোরুগুলো আনন্দে জলে ডুবে আত্মহত্যা করছে। আবার টাকা এল, পুকুর বোজানো হলো। আসল ব্যাপারটা হলো— পুকুর কাটাও হয়নি, পুকুর বোজানোও হয়নি। ওই বলে না— জাস্ট একটু টেবিলের তলায় বাঁ বাতটা রাখুন স্যার। কিঞ্চিৎ ভারী করে দিই। ওই সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই ক্ষমতার বাবুরা সব্যসাচী। তাঁদের ডান-বাঁ দুটো হাতই সমান তালে চলে।

ছাত্রাবস্থায় আমরা কতকগুলি প্রবাদ বা প্রবচন পড়েছি। যেমন, আঙুল ফুলে কলাগাছ, কিল খেয়ে কিল চুরি, পুকুর চুরি এবং আরও কিছু প্রবাদ। সেই সময় খুব ভালো করে এই প্রবাদগুলোর মানে বুঝতে পারিনি। মনে হয়েছে এগুলি কথার কথা। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি এই সমস্ত প্রবাদের কী মহৎ মহিমা। আমার মনে হয় তৎকালীন ব্যাকরণকারগণ ভুলো মনের মানুষ ছিলেন, 'পুকুর চুরির' পাশাপাশি 'নদীচুরি' প্রবাদটি ব্যাকরণে লিখে যাননি। বর্তমান ব্যাকরণকারগণের নিকট আমার অনুরোধ— তাঁরা যেন 'নদীচুরি' এবং 'সাগর চুরিকেও প্রবাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। কেননা কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গার পুকুর চুরি হয়েছে। পুকুর চুরির পর জানি না কার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রীমতী নদীও চুরি হয়ে গেল। এরপর সাগরে যে হাত পড়বে না তার নিশ্চয়তা কে দেবে? বঙ্গোপসাগরের যে অংশটুকু পশ্চিমবঙ্গের কণ্ঠলগ্ন হয়ে আছে তা যে কোনো সময়ে রাজ্যের জনগণের সেবক এবং সব্যসাচীদের যৌথ সহানুভূতিতে যে কোনো সময় কোনো কোনো দরিদ্র জনগণের (পড়ুন হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক) কণ্ঠলগ্ন হতেও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। জনগণের সেবক ও সব্যসাচীদের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

—**মণীন্দ্রনাথ সাহা,**
গাজোল, মালদহ।

শব্দ সংখ্যা কম হলে পড়তে সুবিধে

করোনা মহামারীর আবহে লক ডাউনের কারণে দুনিয়ার সবকিছুই থেমে গেছিল। এখন আনলক শুরু হয়েছে। দৈনিক পত্রপত্রিকাও শুরু হয়ে গেছে। আমার প্রাণের পত্রিকা স্বস্তিকা এখনো অনলাইনেই চলছে। লেখাগুলি তথ্যসমৃদ্ধ। বিষয় নির্বাচন সময়োপযোগী। কিন্তু অনলাইনে পড়ার খুব অসুবিধা। লেখা খুব বড়ো হওয়ার কারণে বেশি সময় ধরে মোবাইলে পড়া সম্ভব হয় না। না পড়তে পারলে মনটা খচখচ করে। জোর করে পড়লে চোখ খচখচ করে, জ্বালা করে।

স্বস্তিকা কর্তৃপক্ষের কাছে আমার আবেদন, গ্রাহকদের হাতে ছাপা পত্রিকা তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। লেখকদের কাছে অনুরোধ, যতদিন অনলাইন থাকবে, লেখার শব্দ সংখ্যা কম করুন।

— **কার্তিক গোস্বামী**
তনতন, পুরুলিয়া

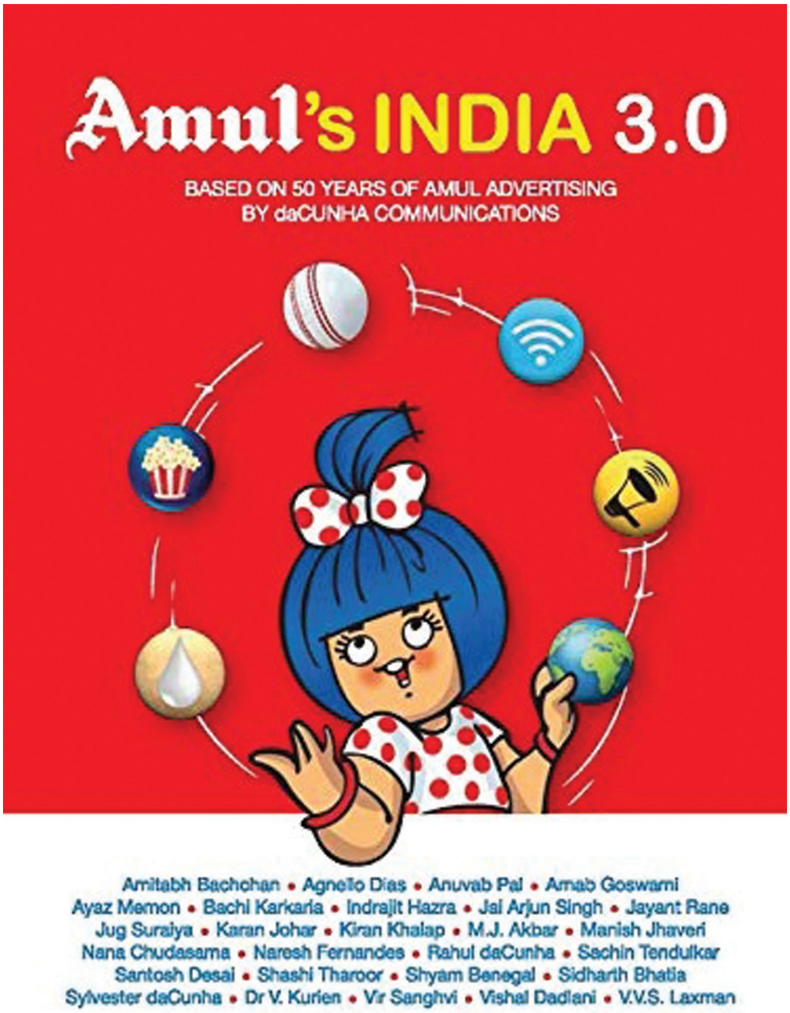

ভারতীয় কৃষকের আরাধ্য দেবতা ভগবান বলরাম

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

থমাস হার্ডির লেখা 'ইন দ্য টাইম অব দ্য ব্রেকিং অব নেশনস্' কবিতাটি যখন হায়ার সেকেন্ডারি পড়ি, আমার এক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক কবিতাটি পড়াতে গিয়ে ভগবান বলরামের কথা বলেছিলেন। কবিতায় আছে, "Only thin smoke without flame/From the heaps of couchgrass;/Yet this will go onward the same/Though dynasties pass." যুদ্ধ হবে, জাতির পতনোত্থান ঘটবে, সাম্রাজ্যের বদল হবে, তবুও কৃষিক্ষেত্র একই ভাবে ফলদায়ী হবে। কৃষক আপন জমিতে লাঙ্গল দিয়ে মাটির ঢেলা ভাঙবে, জমিতে আগাছা-ঘাসের আগুন-ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশে উঠবে। সভ্যতা আপনার প্রয়োজনের গতিতে এগিয়ে চলবে, থেমে যাবে না। জানা যায়, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রর যুদ্ধে হলধর ভগবান বলরাম কোনো পক্ষই অবলম্বন করেননি। তিনি তীর্থে তীর্থে যাবার পথে পথে কৃষক সমাজকে কৃষিকাজে উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন। কারণ বহু কৃষক বহু রাজার সৈন্যরূপে যুদ্ধে গেছেন, কৃষিকাজ না হলে বিপুল মানুষের গ্রাসাচ্ছাদন বন্ধ হয়ে যাবে। আপন আচরণে এই বার্তাটি দেবার মাধ্যমে ভগবান বলরাম বুঝিয়েছেন, দল-নিরপেক্ষভাবে, গোষ্ঠী-নিরপেক্ষভাবে সফল কৃষককে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কৃষির মাধ্যমে দেশহিতৈষণায় নিয়োজিত থাকতে হবে। কিন্তু কৃষিকাজ থেকে কৃষক যেন আপন সৌকর্যে আপন প্রাপ্তি লাভ করেন, তার জন্যও ভগবান অনন্ত আশীর্বাদ রেখে গেছেন। ভগবান বলরাম আমাদের প্রেরণা দিয়েছেন, কীভাবে সকল বাধাবিপত্তি, দুঃখ-কষ্ট ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবিলা করে আত্মবল, আত্মবিশ্বাস ও সংগঠিত শক্তিকে সঙ্গী করে দুষ্টের দমন করা যায়, আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করা যায়। শ্রীবলরাম কৃষক চৈতন্যকে জাগ্রত করার এক মহাশক্তি— কৃষির বিকাশ ও উন্নয়নের দেবতা।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ভগবান বলরামকে দুধ ও পুত্রের দাতারূপেও পূজা করা হয়। তাঁর জন্মদিনে সমগ্র ভারতের নানান অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় উৎসব। মহিলারা ব্রত উদ্‌যাপন করেন। অনুষ্ঠিত হয় মেলা ও কৃষিকৃষ্টির নানান উৎসব। এই দিনটিকে ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ তাদের প্রেরণাদায়ী দেবতার আবির্ভাব তিথিরূপে বিশেষ মর্যাদায় পালন করে। ভাদ্রমাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় বলরাম জয়ন্তী। তিনি কেবল পরম্পরাগত চাষের দেবতা নন, তিনি চাষের প্রকার, সেচন প্রক্রিয়া ও বিকাশের আশীর্বাদক। উন্নত কলাকৌশলে চাষাবাদ, তারই সুবাদে ধন-ধান্যে সম্পদশালী ভারতীয় জীবনের তিনি প্রেরণা। তাঁর অস্ত্র হল বা লাঙ্গল; তাই নাম 'হলধর' বা 'হলায়ুধ', অর্থাৎ লাঙ্গলধারী ঈশ্বর তিনি, কৃষিকৃষ্টির দেবতা। লাঙ্গল হচ্ছে কৃষি ও গ্রাম বিকাশের লক্ষ্যে এক নির্মাণের প্রতীক। কিন্তু নির্মাণের জন্য অশুভ শক্তিকে, অধর্মকে পরাস্ত করতে হয়, দুষ্টকে দমন করতে হয়, তার জন্যও আয়ুধ দরকার। সেই আয়ুধ হলো মুষল, যা ধার্মিক আর শিষ্টলোককে পালন ও রক্ষণে সহায়তা করে।

কে এই বলরাম?

তিনি বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম অবতার। তিনি বসুদেব ও রোহিণীর পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শুভ্র গাত্রবর্ণ তাঁর। তিনি বলদেব, বলভদ্র, অমিত শক্তির অধিকারী। আপন বলে অতিশয় উন্নতির এক ঐশী নাম হচ্ছে 'বলভদ্র'। তিনি 'সংকর্ষণ'; কারণ তিনি দেবকীর সপ্তম গর্ভ। যোগমায়া সেই গর্ভ সংকর্ষণ করে রোহিণীর গর্ভে সংস্থাপন করেছিলেন, তাই তার নাম হলো 'সংকর্ষণ'। তিনি 'শেষনাগ'। নাগরাজ শেষের অবতার। তাঁর মধ্যেই এই নাগ অবস্থান করতেন। দেখা যায়, মৃত্যুকালে যদুবংশ ধ্বংসের আগে কৃষ্ণের মৃত্যুর পূর্বে যোগসমাহিত ধ্যানস্থ বলরামের মুখগহ্বর থেকে লাল রঙের হাজার-মুখো-সাপ বেরিয়ে এসে সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। 'বলরাম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এইরকম— 'বল' শব্দের অর্থ 'শক্তি', ও 'রাম' কথাটির অর্থ 'রমণ' বা 'আনন্দ', আধ্যাত্মিকতার আনন্দ, একত্রে শক্তি ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে বলরামের আবির্ভাব। দ্বাপর যুগে তিনি যেমন শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ, ত্রেতা যুগে তিনি শ্রীরামের অনুজ। দুই যুগেই ভারতীয় গার্হস্থ্য জীবনের শুভঙ্করী আদর্শে পরিচালিত ভ্রাতৃশক্তি। দুই যুগেই তিনি শ্রীবিষ্ণুর মূল আধার রাম ও কৃষ্ণের সহায়ক শক্তি, তাদের বহুবিধ বিপদের সহায়তাকারী। বলরাম গদাযুদ্ধে পারদর্শী এবং ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধের শিক্ষাগুরু।

(বলরাম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

করোনা আবহে মা-ই পড়ুয়াদের একমাত্র সহায়

সুতপা বসাক ভড়

বর্তমানে করোনার কবলে আমাদের জীবন ওষ্ঠাগত। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন মেনে নিতে আজ আমরা বাধ্য হয়েছি। এই পরিবর্তন আমাদের চিরাচরিত দিনচর্যা, ভাবনাচিন্তা ও কার্য পদ্ধতিকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। এই পরিবর্তনের একটি পর্ব হলো ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা। বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কোচিং সমস্ত শিক্ষা সংস্থানগুলির চিরাচরিত কর্মকাণ্ড একরকম বন্ধ। অনলাইন ক্লাস, অনলাইন পরীক্ষা এই যুগের নতুন হাওয়া, কিন্তু এর খরচ? শরীর ও মনের ওপর এর কুপ্রভাব?

সত্যি বলতে, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা কষ্ট করেও তাঁদের সন্তানদের একটি করে স্মার্টফোন, ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ কিনে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এ পর্যন্ত সব ঠিক আছে, কিন্তু যাঁরা নিম্নবিত্ত, গরিব? এমনিতেই লকডাউনের ফলে বেশিরভাগ মানুষের উপার্জন ভীষণভাবে কমে গেছে অথবা বন্ধ। তার ওপর এই খরচ তাঁরা কীভাবে করবেন? অথচ বর্তমানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি কেবলমাত্র এর মাধ্যমেই শিক্ষাদান করে চলেছে। কোনো এক মা তাঁর তৃতীয় শ্রেণীর সন্তানের অনলাইন পড়াশোনার জন্য সঞ্চয় করা ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর স্বামীর কাজ চলে গেছে, তাঁর পক্ষে এখন ল্যাপটপ কিনে দেওয়া সম্ভব নয়।

আর এক কর্মরতা মা, তিনি নিজেও অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে শিক্ষাদান করছেন। তিনি তাঁর নিজস্ব ল্যাপটপে ক্লাস নেন এবং তাঁর তৃতীয় ও অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত দুই সন্তানের জন্য তাদের দুটি ট্যাবলেট কিনে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

আর একজন বিদ্যালয় শিক্ষিকা তাঁর ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে ল্যাপটপ না পেয়ে মধ্য কলকাতার চাঁদনীচকে আসেন কেনার জন্য। করোনা ভাইরাসকে পরাজিত করার জন্য আমরা প্রযুক্তির জগাখিচুড়ি বানিয়ে ফেলেছি।

হঠাৎ করে আমাদের জীবনে এইগুলি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে— ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, স্মার্টফোন, ডেস্কটপ ছাড়াও ইয়ারফোন, মাইক্রোফোন, ওয়েবক্যাম --- সবকিছুই প্রয়োজন। এই লকডাউনে মল, দোকানপাট ঠিকমতো খোলা না পেলেও মানুষ ছুটে চলেছে এসব কেনার জন্য। কারণ একদিকে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম', অন্যদিকে 'অনলাইন ক্লাস'। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কবে খুলবে তার ঠিক নেই, অগত্যা বিভিন্ন নামি-দামি কোম্পানি থেকে শুরু করে স্থানীয় উৎপাদনগুলির বিক্রি হঠাৎ করে কয়েক গুণ বেড়ে গেছে।

অভিভাবকদের ওপর এই বাড়তি আর্থিক বোঝা এসময় একদম অনভিপ্রেত। দোকানদারদের মতে অভিভাবকেরা ৩৫ হাজারের মধ্যে ল্যাপটপ ও ১৫ হাজারের মধ্যে প্রচুর স্মার্টফোন কিনে চলেছেন। এই হঠাৎ বিক্রি তাঁদের কাছেও আশাতিরিক্ত। লকডাউনের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা তাদের অভিভাবকদের ফোন, ল্যাপটপ ইত্যাদি ব্যবহার করেছে। তারপর মা-বাবারা কার্যক্ষেত্রে যেতে আরম্ভ করেছেন। এছাড়া, যেসব পরিবারে একাধিক সন্তান আছে, তারা একই সময়ে অনলাইন ক্লাস করতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। সুতরাং মা-বাবার অসুবিধা সত্ত্বেও বাধ্য হচ্ছেন তাঁদের সন্তানদের শিক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য।

এদিকে ল্যাপটপ, স্মার্টফোনের মাধ্যমে নেট দুনিয়ার হাতছানি এড়াতে পারছে না পড়ুয়ারা। নেটের কুপ্রভাব পড়ছে তাঁদের ওপর। এছাড়া দীর্ঘসময় ল্যাপটপ বা মোবাইলে ব্যস্ত থাকার ফলে তাদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, মানসিক ধৈর্য, কর্মক্ষমতা, শারীরিক নিপুণতা হ্রাস পেয়ে চলেছে। দীর্ঘদিন এইভাবে চলতে থাকলে যারা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ, তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং এসব প্রযুক্তির প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার না করাই ভালো। তাহলে উপায়? উপায় হচ্ছে মা।

একমাত্র মায়েরাই পারেন, তাঁদের সন্তানদের এই কুপ্রভাব থেকে বাঁচাতে। বিদ্যার্থীদের কাছে পাঠ্যপুস্তক আছে। নানান সহায়িকা আছে। ছোটো ক্লাসের সববিষয়েই আজকের মায়েরা সাহায্য করতে সক্ষম, যদি তাঁরা নিজেরাই ওই পাঠ্যপুস্তকগুলি পড়ে নেন। মাধ্যমিক পর্যন্ত বাংলা, ইতিহাস, ভূগোলের জন্য স্বাধ্যায় এবং প্রয়োজন অনুসারে ইউটিউব/অনলাইন ক্লাস যথেষ্ট। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি কাম্য নয়। অতিতে অমৃতও বিষয় হয়ে ওঠে। সুতরাং এই বিশেষ স্থিতিতে স্বাধ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে— যা বিদ্যার্থীদের চরিত্র গঠন করতে সহায়ক হবে। এই কাজে মায়েদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিগতভাবে আমি শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত— এই বিশেষ পরিস্থিতিতে ল্যাপটপ ছাড়াই বিদ্যার্থীদের সাহায্য করছি।

সুতরাং, সনাতন শিক্ষাপদ্ধতিই শ্রেয়। মা'র তত্ত্বাবধানে নিয়মানুবর্তিতা, অনুশীলিত স্বাধ্যায় এবং নিরন্তর অভ্যাস— এগুলিই বিদ্যার্থীদের সঠিক পথে পরিচালিত করবে— ল্যাপটপ, স্মার্টফোন নয়। ■

বৈষ্ণব জগতে ইন্দ্রপতন

শ্রীজীবশরণ দাস প্রভু নিত্যানন্দ চরণে সমাহিত হলেন

তিলক সেনগুপ্ত ।। বীরভূম জেলার বীরচন্দ্রপুর শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ জন্মস্থান আশ্রম তথা 'নিতাই বাড়ি'র সার্থক রূপকার শ্রীজীবশরণ দাস প্রভু নিত্যানন্দলোকে লোকান্তরিত হলেন। কলকাতায় চিকিৎসা চলাকালীন গত ১৫ আগস্ট তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। কম-বেশি দীর্ঘ ঊনপঞ্চাশ বছর তিনি নিতাই বাড়ি আশ্রমের অধ্যক্ষ পদে আসীন ছিলেন। চরম প্রতিকূলতার মধ্যে লড়াই করে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্মস্থানকে সারা পৃথিবীর বুকে পরিচিত করে দেন এই বৈষ্ণব সাধক। তাঁর প্রয়াণে বৈষ্ণব জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। ১৬ তারিখ সন্ধ্যায় যথাযোগ্য মর্যদায় তাঁর পূতদেহ সমাহিত করা হয়। তাঁর পার্থিব শরীরকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বৈষ্ণব তীর্থের প্রতিনিধিরা আশ্রম প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। শ্রীনবদ্বীপধামের সমাজ বাড়ি আশ্রম, কলকাতার শ্রীপাটবাড়ি, শ্রীখণ্ডের মধুমতী সমিতি, পুরীর ঝাঁঝপিঠা মঠ, বৃন্দাবনের গোবিন্দ কুণ্ড আশ্রম, কাটোয়া গৌরাঙ্গ বাড়ি, কাটোয়া মাধাইতলা, উত্তর ২৪পরগনার পলতার নিতাই গৌরাঙ্গ ভক্ত সেবাশ্রমের মতো বহু তীর্থভূমি থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে আসে বৈষ্ণব জগতে।

বঙ্গদেশের অহিংস গণআন্দোলনের নেতা যদি হন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, তবে অবশ্যই সেই আন্দোলনের পুরোধাপুরুষ ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। সেকারণেই তাঁকে বীরভূমের পূর্ণশশী রূপে আখ্যায়িত করে থাকে সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ।

বীরভুমের ময়ূরেশ্বর ব্লকের ডাবুক পঞ্চায়েতের অন্যতম গ্রাম বীরচন্দ্রপুর। যে গ্রামে আজ থেকে ৫৪৭ বছর আগে পিতা হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে ও মা পদ্মাবতীর কোলে আবির্ভূত হন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। ডাকনাম নিতাই। যে বাড়িতে বসবাস করতেন হাড়াই পণ্ডিত সেই বাড়িটি আজও অবিকৃত রয়েছে। বাড়িতে নিত্যানন্দের আবির্ভাব স্থানটি আজও সুচিহ্নিত। এটি সূতিকা মন্দির বা আঁতুরঘর নামে খ্যাত। এই বাড়ি থেকে বারো বছর বয়সে সন্ন্যাসী শঙ্করারণ্য পুরীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন নিত্যানন্দ প্রভু। উত্তরকালে বৃন্দাবনবাসী রাঘব পণ্ডিত গোস্বামী নিতাই বাড়িতে এসে প্রভু নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সেই বাড়িটি নিত্যানন্দ জন্মস্থান আশ্রম তথা নিতাইবাড়ি রূপে সারা

পৃথিবীর বৈষ্ণব সমাজের কাছে সমাদৃত হয়ে ওঠে।

সেই নিতাই বাড়ি আশ্রমের দ্বাদশ মঠাধ্যক্ষ রূপে আজ থেকে ঊনপঞ্চাশ বছর আগে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী শ্রীজীবশরণ দাস। কলকাতা বরাহনগর শ্রীপাটবাড়ি আশ্রমের বিশিষ্ট সাধক নামাচার্য শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের মন্ত্রশিষ্য শ্রীজীবশরণ দাস নিতাই বাড়ির দায়িত্ব নিয়ে এলেন। সেকালে আশ্রমে যাবার রাস্তা বলে কিছু ছিল না। বিদ্যুতের আলো ও পানীয় জলের কোনো সুব্যবস্থা ছিল না। আশ্রমে সেবা পুজোর জন্য সম্বল কেবলমাত্র ভিক্ষা। দুবেলা ভিক্ষা করে যা জুটত তাই ঠাকুরের ভোগ দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতেন সেই তরুণ সন্ন্যাসী। আশ্রমে একটি মাটির মাঠকোঠা ঘর। জঙ্গল ঘেরা আশ্রমে শুধুমাত্র ঠাকুরের মন্দির ও নাটশালা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এহেন প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দীর নিরলস চেষ্টায় আজ নিতাইবাড়ি আশ্রমে যে প্রভু নিত্যানন্দের মন্দির তৈরি হয়েছে তা সারা বীরভূমের সর্ববৃহৎ সুউচ্চ মন্দির। নয় চূড়া বিশিষ্ট ওড়িশার জগন্নাথদেবের মন্দিরের আদলে এবং বঙ্গদেশের মন্দির শৈলীর মিশ্রণে নির্মিত হয়েছে মন্দিরটি। মন্দিরগাত্রে ওড়িশা ও রাজস্থনের পাথর খোদাই করা শিল্পকর্ম শোভা বর্ধন করছে সারা দেবালয় জুড়ে। আজ বীরভূমের পর্যটন মানচিত্রে একটি উজ্জ্বল স্থান বীরচন্দ্রপুর নিতাইবাড়ি। আশ্রমে মাঘ মাসে ন'দিন ব্যাপী বিশাল উৎসবের আয়োজন হয় নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে। সেসময় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বৈষ্ণব সাধকরা এসে উপস্থিত হন।

নিতাই বাড়িতে শুধু মন্দির নয়, তৈরি হয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থ সম্ভারে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। বৈষ্ণব সাধকদের ব্যবহৃত সামগ্রীর প্রদর্শনী, নিত্যানন্দ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মতো একাধিক প্রকল্পের রূপায়ণ করেছেন শ্রীজীবশরণ দাস। আশ্রম প্রঙ্গণে অতিথি ও পুণ্যার্থীদের থাকার জন্য সুশিল অতিথিশালা। আশ্রম প্রঙ্গণে জৈব চাষের মাধ্যমে সবজি উৎপাদন, ফল ও ফুলের বাগান দর্শকদের আকর্ষিত করে। রয়েছে সুবিশাল গোশালা। গোবর গ্যাসের মতো একাধিক প্রকল্পে সমৃদ্ধ আশ্রম প্রঙ্গণ। তাঁর উদ্যোগেই বছরে একাধিক বার স্বাস্থ্যশিবির, চক্ষু পরীক্ষা শিবির, নিঃশুল্ক চশমা বিতরণ, গরিব-দুঃখীদের শীতবস্ত্র বিতরণ পর্ব চলে। বন্যা, খরা, করোনার মতো বিপর্যয়ের সময়েও খাদ্যসামগ্রী বিতরণে অগ্রণী ভূমিকায় দেখা গেছে সন্ন্যাসী শ্রীজীবশরণ দাসকে।

আশ্রম থেকে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় আশ্রমের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'উত্তরণ', যা সারা দেশের বাঙ্গালি বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে একান্তভাবে সমাদৃত। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর ভাবাদর্শ প্রচারে প্রতি বছর প্রকাশিত হয় গবেষণামূলক গ্রন্থ 'ধীমহি'। সারা ভারতের বৈষ্ণব তীর্থসমূহের বিবরণ তুলে ধরা হয় এই গ্রন্থের পাতায় পাতায়। শ্রীপাট পর্যটন, বিগ্রহ সেবা, সমাধি সেবা সম্পর্কিত তথ্য সংবলিত গবেষণামূলক গ্রন্থ এই ধীমহি। এছাড়াও প্রায় পঞ্চাশটি গ্রন্থ প্রণয়ন শ্রীজীবশরণ দাসের অমর কীর্তি।

বৈষ্ণব সাহিত্যে যে রস কীর্তনের উল্লেখ আছে, তার একজন বিখ্যাত কীর্তন সেবক শ্রীজীবশরণ দাস। তিনি বৃন্দাবন পুরী, নবদ্বীপ, কালনা, কাটোয়া, কলকাতা, জয়পুর, সলেমাবাদ, নাথদ্বারা ও বারাণসীর মতো একাধিক তীর্থক্ষেত্রে কীর্তন করে শ্রোতাদের মোহিত করেছেন। বহু লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। বহু তীর্থক্ষেত্রে তাঁর দান সর্বজনবিদিত। 'নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ' , ' মহানাম কালচার অ্যান্ড ওয়েফেয়ার ট্রাস্ট'-এর মতো ইতিহাস, ঐতিহ্য, পুরাতত্ত্ব ও সংস্কৃতির গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষক।

তাঁর মহাপ্রয়াণে বঙ্গভূমির বৈষ্ণব জগৎ একজন অভিভাবককে হারালো। কলকাতার বরাহনগর শ্রীপাটবাড়ির পণ্ডিতপ্রবর শ্রী মাধবানন্দ দাস বাবা বলেন, ' শুধু নির্দিষ্ট কোনো সম্প্রদায় নয়, সমগ্র জাতি এক অভিভাবককে হারালো'। শুধু পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ নয়, বৈষ্ণব তীর্থভূমি বৃন্দাবন ও ওড়িশার বিভিন্ন মঠ-মন্দিরের সাধকরা তাঁর প্রয়াণে শোকাহত। পুরীর ঝাঁঝিপিটা মঠের অধ্যক্ষ শ্রী সচ্চিদানন্দ দাস বাবা বলেন, ' আমরা মর্মাহত ও শোকাহত। উনি আমাদের কাছে বটবৃক্ষসম ছিলেন।' শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীরাধাকুণ্ডের বৈষ্ণব সাধক পণ্ডিত শ্রী বৈষ্ণবপদ দাস বাবাজী বলেন, ' এই ক্ষতি সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যের ক্ষতি।'

বঙ্গভূমি জুড়ে যে বিভিন্ন চৈতন্য পরিকরদের শ্রীপাট রয়েছে, সেসব স্থানের বর্তমান আচার্যরাও তাঁর মহাপ্রয়াণে শোকাহত। শ্রীনামব্রহ্ম শ্রীপাট নদীয়ার আলাইপুরের সেবক রাধাবিনোদ ঠাকুর গোস্বামী বলেন, 'শ্রীজীবশরণ দাসের প্রয়াণে বঙ্গভূমির বৈষ্ণব জগৎ আজ দিশেহারা ।' শ্রীপাট কানাইডাঙ্গা মন্দিরের সেবক কৃষ্ণেন্দু গোস্বামী বলেন, ' গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ শ্রীপাদ শ্রীজীবশরণ দাসজী শ্রী নিতাইচরণ তথা ভক্ত হৃদয়াকাশে বিরহ মেঘে ঢাকা পড়লেন। আমরা আজ দিশেহারা ।' শ্রীখণ্ড মধুমতী সমিতির অধ্যক্ষ প্রকাশানন্দ ঠাকুর বলেন, 'শ্রীখণ্ডের আত্মজন শ্রীজীবশরণ দাসের লোকান্তরিত হওয়ায় আমরা বাকরুদ্ধ। প্রিয়জন, নিজজনকে হারিয়ে আমরা ব্যথিত।' কলকাতা মহানাম অঙ্গনের সাধক বন্ধু গৌরব ব্রহ্মচারী বলেন, 'এই মহাপ্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ। এ এক অপূরণীয় ক্ষতি।' মুলুক ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী সঙ্ঘমিত্রানন্দ মহারাজ বলেন, ' বীরভূমবাসী আজ এক মানব দরদি আপনজনকে হারালো।'

□

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

SURYA
Energising Lifestyles
Innovative
DESIGN
World-Class Quality
PRODUCTS
Just One Name
SURYA
lighting
fans
appliances
pipes
SURYA ROSHNI LIMITED
E-mail: consumercare@sroshni.com I www.surya.co.in
Tel.: +91-11-47108000, 25810093-96
Toll Free No.: 1800 102 5657
/suryalighting I /surya_roshni